বাঙালীর
গৌরব
যতীন্দ্রনাথ

বাঙালীর গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ

সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভারত পাবলিশার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

॥ এক ॥

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর এক ভাষণে বললেন, "প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি বিজ্ঞানী; কিন্তু বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধ মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের আরও একটি বিশেষ পরিচয় আছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁর ঐকান্তিক ও নিরলস প্রয়াসে সে পরিচয় পরিস্ফুট।"

বিজ্ঞানে মৌলিক চিন্তার এমনি করে যে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছেন, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি যে সব দান রেখে গেছেন তার গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব বিশ্বজন-স্বীকৃত। 'বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান'-এর প্রবর্তক হিসাবে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু ঋষিকল্প এ মানুষটি কেবল যে বিজ্ঞান সাধনায় একনিষ্ঠ ছিলেন তা নয়, সঙ্গীতে দর্শনে সাহিত্যেও ছিল তাঁর সমান অধিকার ও অনুরাগ। তিনি ছিলেন পূর্ণতার সাধক। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করে দেশের সর্বস্তরে বিজ্ঞান চেতনা বিস্তারের প্রয়াসে তাঁর ভূমিকা বাঙালী জাতি চিরকাল সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

তাঁর জীবন কাহিনীতে আমরা দেখি যে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার গোয়াবাগানের বসু পরিবারে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন রেলকর্মি।

আবার বাংলা দেশের প্রথম রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস্'-এর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

সত্যেন্দ্রনাথের মাতা আমোদিনী দেবীর পিতা ছিলেন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজীবী।

সত্যেন্দ্রনাদ্রের যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন তাঁকে জোড়াবাগানের নর্মাল স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর তিনি ইণ্ডিয়ান স্কুলে এসে ভরতি হন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্কুল জীবনে শেষ দুবছর পড়েন হিন্দু স্কুলে। হিন্দু স্কুলে পড়ার সময়েই শিক্ষকগণ সত্যেন্দ্রনাথের বিরল প্রতিভার পরিচয় পান।

গণিতে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে হিন্দু স্কুলের গণিত শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সী বলেছিলেন, কালে সে মস্তবড়ো গণিতবিদ হবে।

বোস পরিসংখ্যানের সাহায্যে প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম মতবাদের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষকের ভবিষ্যৎবাণী সফল করেছিলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

এরপর সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস্-সি ক্লাসে ভরতি হন। সত্যেন্দ্রনাথের পড়াশোনা কেবল পাঠ্যবই-এর গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নানান বিষয়ের ওপর তিনি পড়াশোনা করতেন।

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তিনি গভীর অনুরাগের সঙ্গে পড়তেন সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন। পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের অধ্যয়নে বহু সময় ব্যয় করা সত্ত্বেও, সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু আই. এস্-সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর তিনি অংকে অনার্স সহ বি. এস্-সি. ক্লাসে ভরতি হন।

এই সময় তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের আর এক কৃতী বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। বি এস্.-সি পরীক্ষাতেও সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি মিশ্রগণিত নিয়ে এম্. সি. ক্লাসে ভরতি হন। এই পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম হন।

সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল অধ্যাপনা কাজ নেবার। শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবেই মনের মতো একটা কাজ পেয়ে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান ও মিশ্র-গণিতের লেকচারার হিসাবে যোগ দিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের রীডার হিসেবে যোগ দিলেন। তখন পদার্থ বিজ্ঞানের এক যুগসন্ধিক্ষণ। সনাতন পদার্থ বিজ্ঞানের ভিত ভেঙে পড়েছিল—কোয়ান্টাম মতবাদ, আপেক্ষিকতাবাদের মতো বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা তখন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোয়ান্টাম মতবাদ তখনও সম্পূর্ণ পরিণত হয়নি। প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বে কয়েকটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করে সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়টির ওপর নতুন-ভাবে আলোকপাত করতে আগ্রহী হয়ে গবেষণা শুরু করেন। অচিরেই তিনি এ বিষয়ে একটি মৌলিক গবেষণা সূত্র রচনা করেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'প্লাঙ্কের সূত্র এবং আলোক-কোয়ান্টাম প্রকল্প'। প্রবন্ধটি শেষ করে তিনি সেটিকে ফিলজিফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন ও প্রখ্যাত পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইনের অভিমত পাবার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটির একটি অনুলিপি তাঁর কাছেও পাঠান। প্রবন্ধটির মৌলিকত্বে আইনস্টাইন বিস্মিত হন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ প্রবন্ধটি পদার্থ বিজ্ঞানের নূতন সূচনা করবে।

আইনস্টাইন নিজে প্রবন্ধটির অনুবাদ করে একটা জার্মান পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। সঙ্গে অনুবাদকের টীকায় আইনস্টাইন লেখেন, 'আমার মতে প্লাঙ্কের সূত্র থেকে বোস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সূচনা করেছে।"

বোস উদ্ভাবিত পরিসংখ্যান-এর প্রয়োগক্ষেত্র যে ব্যাপকতর—আইনস্টাইন তা উপলব্ধি করেছিলেন। এ পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণাও করেছিলেন।

বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান তারই ফলশ্রুতি।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে সত্যেন্দ্রনাথ ইউরোপে যান। এ সময় ফ্রান্স ও জার্মানীর বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও মত-বিনিময় ঘটে। আইনস্টাইনের এ সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভের ফলে সত্যেন্দ্রনাথ নানা সম্মানে ভূষিত হতে লাগলেন।

১৯২৯ সালের জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন।

১৯৪৫ সালে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এর কিছুদিন পরেই বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে সরকার তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' রূপে বরণ করে।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে সত্যেন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হন এবং কিছুকাল ঐ পদে আসীন থাকেন।

১৯৬১ সালে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে।

সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সাধনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেও বিজ্ঞান তাঁর শিল্প সাধনাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চাতে তিনি বহু সময় ব্যয় করতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এসরাজ ও বাঁশি বাজাতেন। সঙ্গীতের নেশায় অনেক সময় তাঁর কাজকর্মের ক্ষতি হত। সেজন্য সতীর্থ মেঘনাদ সাহা অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথের ওপর বিরক্ত হতেন। মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য সভায় অংশ নিতেন। 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর নিয়মিত সভ্য সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ আগ্রহশীল। 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠায় তিনিই অগ্রণী ভূমিকা নেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারই এ পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন—"যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, না হয় বিজ্ঞান বোঝেন না।"

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করে, প্রকাশের ব্যাখ্যা করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বিজ্ঞানের বাহক হিসাবে বাংলা ভাষাও অক্ষম নয়। তাঁর লেখা 'বিজ্ঞানের সঙ্কট' প্রবন্ধটি বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে আদর্শ স্থানীয়।

পাণ্ডিত্যের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ বড়ো ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মহত্ত্বের বিচারে বোধ করি তিনি ছিলেন অনেক বড়ো। তিনি শুধু

বড়ো বিজ্ঞানী নন, বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন। দুঃস্থ মানুষদের সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত।

মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাস। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিয়ে অনেকে এই অকপট হৃদয়বান মানুষটিকে প্রতারণাও করেছে।

কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হারান নি।

১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে পরিণত বয়সে ঋষি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অনুকরণীয় জীবনাদর্শ।

বাঙালীর গর্ব সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর জীবন কাহিনী আমরা সংক্ষেপে জানালাম। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিস্ময়কর বিজ্ঞানের তাঁর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চিন্তায় 'ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা' এই প্রসঙ্গে আলোচনায় যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—

"বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষক কলিন রোমান বলেছেন মানুষের মনে বিজ্ঞান চেতনার দীপশিখা প্রথম জ্বলে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, মধ্যপ্রাচ্যে। সেই সময় সভ্য মানুষ শুধু প্রাত্যহিক জীবনেই নয়, নিছক জানার বা বোঝার আগেই নানা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করে। তার আগে প্রাক-প্রস্তর যুগের মানুষ শিকার ও গৃহস্থালির প্রয়োজনে ফ্লিন্ট পাথরের টুকরোর সঙ্গে বানিয়েছিল তীর, ছুরি, হাতুড়ি ইত্যাদি নানা জিনিস।

'উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে বোহেমীয়, যাযাবর মানুষের জীবনে যুগান্তর আনলো অগ্নি আবিষ্কার আর কৃষিপর্ব প্রচলন। সেই সময় গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট গ্রাম। উদ্ভাবিত হল আদি কৃষিযন্ত্র লাঙ্গল। মানুষ ক্ষেতে জলসেচের জন্য তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকেও কাজে লাগাতে শিখলো। শস্য সংসরণ, ফসল সেচে আনা নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বানাতে শিখলো, কুমোরের চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মানুষ বানাতে শুরু করলো নানা ধরনের মাটির পাত্র। ঐ সময়ে বয়ন শিল্পেরও উদ্ভব ঘটে। ভারী জিনিস সহজে তোলার জন্য কপিকল, আনয় (Fulcolum) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

প্যাপিরাস জাতীয় নলখাগড়া থেকে মিশরের মানুষ প্রথম লিখনের উপযোগী কাযজ বানায়। ইরানের মানুষেরা প্রথম চাকাযুক্ত গাড়ি বানিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনে। প্রাচীন ভারতে সংখ্যা চিহ্নের বিশেষত '0' চিহ্নের উদ্ভব হলেও মাপ-জোক ও ওজন নির্ধারণে প্রাচীন মিশর, সুমেরু দেশ ও সিন্ধু সভ্যতার বিজ্ঞানীরা অগ্রণী হয়েছিলেন। কয়েক হাজার বছর আগে চীনের বিজ্ঞানীরা অতি দ্রুত মাত্রিক পদ্ধতিতে যোগ বিয়োগ করার উপযোগী গণকযন্ত্র বা 'আয়াবাম' বানিয়ে নিয়েছিলেন। একালে যে ঘড়ি ছাড়া আমাদের এক মিনিটও চলে না, তেমন 'আস্ট্রোনমিক্যাল' ক্লক প্রথম বানিয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানীরা আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে। বিজ্ঞানী টেসিবিয়স [Ctesibios] বানিয়েছিলেন জলঘড়ি। জল তোলার উপযোগী বিশেষ ধরনের বাষ্প যন্ত্রচালিত ঘড়ি প্রথম আবিষ্কার হয় চীন দেশে। প্রথম ছাপাখানা এবং কম্পাস যন্ত্র ঐ দেশেরই আবিষ্কার। এ সমস্তই ঘটেছিল খ্রীষ্টজন্মের আগে। গ্রীসের মানুষেরা প্রথম পৃথিবী ও মহাকাশের মানচিত্র বানায়। ধাতব বিদ্যার ক্ষেত্রে, চিকিৎসশাস্ত্রে, স্থাপত্য বিদ্যা এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে গ্রীকচিন্তাধারার

দাম বড় কম ছিল না। অন্যদিকে বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শল্য চিকিৎসা, রসায়ন শাস্ত্র, জীববিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানীরা যে সব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, তা মানুষের জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট সহজ করে দেয়। জলস্রোতের কিংবা বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীন গ্রীস ও ইরানের বিজ্ঞানীরা যথাক্রমে ওয়ার্কিং মিল ও উইণ্ডমিল বানিয়েছিলেন। সেখানে জল অথবা বাতাসের শক্তিতে চাকা ঘুরিয়ে মানুষ প্রথম শস্য মাড়াইয়ের কাজ করতে শুরু করেছে।

'ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা' প্রবন্ধটিতে আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁর চিন্তাধারার এক অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠতা।

বাঙালীর গর্ব সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এক নতুন যুগের আলোর নিশানা।

বাঙালীর গর্ব সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি 'বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতি' প্রসঙ্গে ছাত্রসমাজের কাছে একদা যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজকের দিনে বাঙালীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি যা বলেছিলেন তা হচ্ছে—

"একদিন বাঙলার আয়তন তথা পরিধি ছিল বিরাট, হরিকেল, রাঢ, বাঙ্গাল, তাম্রলিপ্ত, গৌড়, বারেন্দ্রভূমি ইত্যাদি নিয়ে যে বৃহৎ অঞ্চল সেটা আজ খণ্ড, বিখণ্ড, বিযুক্ত বিভক্ত হতে হতে 'পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যে'র মধ্যে এসে ঠেকেছে। তবুও রঙ্গভরা এই ভঙ্গ বঙ্গদেশের প্রশস্তি আমরা প্রতি বর্ষ শুনি—'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল', আর আমাদের বুক গর্বে ভরে ওঠে, আমার বাঙলা মায়ের বদনখানি মলিন হলে আমরা নয়ন জলে ভাসি।"

বাঙালীর অস্তিত্বের কথা প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যেও চিহ্নিত হয়ে আছে। বাঙলার জ্ঞানগরিমা শৌর্যবীর্যের সংগ্রামী ভূমিকা ভুবনবিদিত। সমাজের কাঠামোর ইতিহাসই সঠিক জনসাধারণের ইতিহাস। কাজেই বিত্তবান, ভূ-স্বামী, ভূমিহীন কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী, সমাজ প্রেমিক, শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠী—অর্থাৎ 'অবীর্তিতাস্ অচন্ত্যানাম প্রভৃতি সকলকে নিয়েই প্রাচীন বাঙলার সমাজ। সেই বাঙলার সমাজ ছিল সুসংবদ্ধ এবং শান্তিধাম। মধ্যযুগে সেই ঐতিহ্যময় স্রোত অব্যাহত ছিল। হিন্দু রাজাদের আধিপত্য খর্ব হয়ে মুসলমান শাসকদের আমলে বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যময় জ্যোতিঃদীপ্তি আজো বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের যুগে বাঙলা বিকশিত-শতদলে প্রস্ফুটিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দী বাঙলার ধর্মজীবনে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নিয়ে আসে স্বর্ণ যুগ। তারপর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের ফলে বাঙলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে নেমে আসে অকাল ছায়া। আকবরের আমলে বাঙলার সুবেদার মানসিংহের অত্যাচারে গ্রামজীবন বিধ্বস্ত হয়। এল ইংরেজ। তারা কলকাতা সুতানটী এবং গোবিন্দপুরকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যকেন্দ্র তথা রাজধানী স্থাপন করল। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে লর্ড কর্নওয়ালিশ বাঙলাকে ঠেলে দিল ক্রমনিঃস্বতার গর্ভে। বাঙলার সুখ-শান্তি মিলিয়ে গেল কোথায়!

মনে রাখা দরকার, 'অবনতাবস্থায় বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী'—ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিল বাঙালী মনীষা, বাঙালী-বীর্য, বাঙালী হৃদয়। ঊনবিংশ শতাব্দী স্বর্ণযুগের গৌরব। সারা ভারত তলিয়ে রইল—কি ভাবে বাঙলা, কি বলে সেই দিকে। এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর অভিঘাতেও বাঙালীর মূল্যবোধ হল বিপর্যস্ত—অর্থনীতিতে লাগল চরমতম আঘাত। আবার ঘনিয়ে এল

বাঙলার বুকে অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে আত্মবিশ্বাস রেখে ভারতবর্ষ লাভ করল স্বাধীনতা। বাঙলা হল বিভক্ত।

বিভক্ত বাঙলা স্বাধীনতার পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে পারল না। পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিল শরণার্থী সমস্যা, পূর্ববঙ্গে দেখা দিল কৃষিসমস্যা। ধান এবং শস্যের অভাবে, কাঁচামালের অভাবে বাঙলা পড়ল ভয়ংকর সংকটে। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলি বন্ধ হবার উপক্রম হল। শুরু হল শ্রমিকদের বিরোধিতা। হাজার হাজার মানুষ, দিশেহারা মানুষ খাদ্যবস্ত্রের বেকারীর জ্বালায় বিধ্বস্ত বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

...কিন্তু বাঙালীর মধ্যে রয়েছে দুর্বার প্রাণশক্তি। পূর্ব সুরীদের আদর্শে সে জীবনকে সহজ করতে চায়।"

মহাবিজ্ঞানী 'নিউটন প্রসঙ্গে' সত্যেন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—

"নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতকারক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে চরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পর্যালোচনা করিলে মহোপকার ও উন্নতিলাভ করিতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তদপেক্ষা ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয় জীবনীবৃত্তান্ত পাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারিতেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে গ্রহণের গতি, ধূমকেতুর কথা, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুইপ্রকার পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে এই বিষয়ে কোন ব্যক্তির মনে উদিত হয় নাই। তিনি অতিশয় পরিশ্রম ও ব্যগ্রতা সহকারে অদ্ভুত বিষয়বস্তুর যথার্থ তাৎপর্য

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর তাঁহার সমুদয় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রজ্ঞা অনুজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যচর্চা' প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—

"আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গত বিজ্ঞানী হলেও তাঁর মধ্যে একটা দুর্লভ শিল্পচেতনা ছিল। সাহিত্য কর্মে তিনি বেশী সময় দিতে পারেন নি। কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তাতেই তাঁর সাহিত্যবোধেরই ছাপ রাখতে পেরেছেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন 'অব্যক্ত' প্রকাশ করে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন···আর জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'তোমার অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্ব-পরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া বারবার ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানরাণীকে তুমি সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করতে পারত কেবল তোমার অনবধানে সে অনাবৃত হইয়া আছে।"

বাঙালীর গর্ব সত্যেন্দ্রনাথ।

আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর জীবন ও সাধনা এক স্মরণীয় ইতিহাস।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁর বিভিন্ন দিকের বিস্ময়কর প্রতিভার স্মরণীয় কাহিনীগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

॥ দুই ॥

সত্যেন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞানীর জীবন দর্শন' নিয়ে যে কথা আমাদের জানিয়েছেন তা আমাদের মনে রাখা দরকার। তাঁর জীবন দর্শনে যেন জাতির একটা নিজস্ব চরিত্র খুঁজি পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমার জীবন দর্শনের মূলমন্ত্র সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষই চরম ও পরম সত্য যা আমাদের প্রত্যেকের উপলব্ধি করা উচিত। আমাদের দেশের এক প্রাচীন বক্তির এই বাস্তব জীবনযাত্রাকে একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের পূর্ণ মনুষত্বের বিকাশ আমি এই আদর্শের মধ্যে দেখতে পাই। যে সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি মনুষত্বকে অবমাননা করে, যা কিছু মনুষত্ব বিকাশের পরিপন্থী তা আমি কোন দিনই সমর্থন করিনি।"

এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

"আমি যে আমার নিজের দেশকে ভালবাসি না তা নয়। তবে আমি এই বলি যে, ভালবাসা যদি এমন রূপ নেয় যাতে পদে পদে সত্যের অপলাপ করতে হয়, তবে সে ভালবাসার কোন দাম নেই। যাকে গ্রহণ করতে হবে, যার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার যদি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি ভুল বলে বর্ণনা করি তা হলে সে কাব্যের জগতেই চলে।

অনেককে বলতে শুনেছি যে, আজকাল এ দেশে ও অন্যত্র বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে প্রকৃতির শেষ অবধি মানব সমাজের পক্ষে মঙ্গল হবে না। দুঃখের কথা এই যে, যাঁরা দেশে দেশে রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন, তাঁরা বিজ্ঞানী নন। অনেক সময় তাঁরা ধার্মিক, অনেক সময় তাঁরা

জাতীয়তাবাদী।...বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের মধ্যে হিংসা দ্বেষ হানাহানি নেমে গেছে। এই অনুযোগও অনেকে করে থাকেন এবং তাঁরা সেই সঙ্গে এই কথাও বলেন যে, ধর্মের পথে মানুষ চালিত হলে এসব এক হবে। ইতিহাস কিন্তু এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। হাজার হাজার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব যে পৃথিবীতে যে সব দেশে ধর্মভাব প্রবল ছিল, দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রবল ছিল সে-সব দেশেও কোনকালে হিংসা-দ্বেষ সংঘাতের বিরাম হয়নি। পৃথিবীটা যদি শুধু ধার্মিক লোক নিয়ে ভরে থাকত তা হলেও বোধকরি পৃথিবী থেকে হিংসা-দ্বেষ লোপ পেত না।"

'বিজ্ঞানীর জীবন দর্শন' এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখার মধ্যে আমরা দেখেছি, সত্য সুন্দরের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, ঐক্য হচ্ছে মানুষের বিশেষ সম্পদ, এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—

"আজকের দিনে মানুষ যে হিংসা-দ্বেষ বিসর্জন দিয়ে ঐক্যের পথে, ভ্রাতৃত্বের পথে এগোতে শুরু করেছে, সেটা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানচর্চার ফলেই। কেননা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্য সমাজ-এর একথা কেবল বিজ্ঞানীরাই বলেছেন। আজকের দিনে মানুষ যে সারা মানুষের জন্যে ভাবতে শিখেছে, বহু দেশবাসী যে একত্র হয়ে আজ ভাবতে যাচ্ছে বিজ্ঞান না থাকলে এটা সম্ভব হতো না। মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে। সে যদি দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব অনুসরণ করে, তা হলে যে সংঘাত ও ত্রাসের প্রয়োগ আজ দেখা যাচ্ছে, তার নিয়ন্ত্রণ হবে। তাহলেই সার্বজনীন বিশ্বমানবের আবির্ভাব হবে। ভবিষ্যতের সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, তার মধ্যে থাকবে মানুষের স্থান। বিজ্ঞানের পথেই মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি।"

"ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমি তাই মনে করি জীবন দেবতার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তার চর্চা ও অনুশীলন নিভৃতে করা দরকার। তার ভেতর থেকেই মানুষ হয়ত পাবে তার

প্রতিদিনের কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা। বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশঃ ওপরের দিকে চলেছে—এটা বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি, নিছক সমাজের ওপর নির্ভর করলে মানুষের জয় কম এগোবে না।”

আমরা জানি শুধু একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী হিসেবেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়।

বিজ্ঞানের আঙিনা পার হয়ে, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই তাঁর ছিল অবাধ গতি।

সত্যেন্দ্রনাথের আরও বড়ো পরিচয় হলো তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের সর্বজনের জন্য বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তুলতে বিশেষ প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এ দেশে মানুষের বিজ্ঞান চর্চার পথপ্রদর্শক তিনিই।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য—প্রীতি প্রসঙ্গে প্রখ্যাতনামা অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন—

“জার্মানি ভাষায় তাঁর দখলের পরিচয় আগেই পেয়েছিলুম। ফরাসী ভাষায় তাঁর দখলের পরিচয় আরো কয়েকবার পেলুম। একদিন দেখি মিশলে রচিত মূল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়ছেন। বললেন, ইংরেজী তর্জমা পড়ে আশ মেটেনি। বহু চেষ্টায় মূল সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তাই তন্ময় হয়ে অধ্যয়ন করছেন। ফরাসী বিপ্লব আমার নিজের প্রিয় বিষয়। অথচ আমি তার জন্য আয়াস স্বীকার করিনি। আলোচনা করলেন কৌতূহলীর মতো। সে রকম কৌতূহল যদি ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখতুম।…

এর পরে একদিন লক্ষ্য করি, তিনি ফরাসীদের আরো পুরোনো ইতিহাসের ভক্ত। বললেন, ফরাসী বিপ্লবকে বুঝতে হলে আরো কয়েক

শতক পেরিয়ে যেতে হয়। তাই তিনি পড়ছেন যোড়শ শতাব্দীয় ইতিবৃত্ত।......অন্য একদিন দেখি সংস্কৃত বই পড়ায় নিবিষ্ট। ভাসের 'চারুদত্ত'। সবটা মনে নেই। যতদূর বুঝলাম পরবর্তী নাট্যকারের মৃচ্ছকটিক এরই উপর ভিত্তি করে রচিত। কোনটা আগে কোনটা পরে তার প্রমাণ একই শব্দের বিধান। এর থেকে এলো পদ-তত্ব। সংস্কৃত খুব ভালো জানা ছিল তাঁর। আমার তেমন নয়। অবাক হয়ে শুনলুম। আরেকদিন দেখি পিসেল প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণের মূল জার্মাণ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ তাঁর হাতে। মূলও তিনি পড়েছেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি যেন কত জানি। তারপর একদিন এক সন্ধ্যাবেলা মশারি খাটিয়ে শুয়েছেন। ভাবলুম অসুখ-বিসুখ হয়েছে। তা নয়, মশার জ্বালায় মশারির আশ্রয় নিয়েছেন। সেই অবস্থায় পড়া হচ্ছে আফগানিস্তানের সদ্য আবিষ্কৃত আহোমের আরামাইক লিপিতে উৎকীর্ণ অনুশাসন। আমার কাছে নতুন।...বিদ্যা তা যে কোনো বিদ্যাতেই হোক, সত্যেন্দ্রনাথের নিঃশ্বাস বায়ু। জ্ঞানকে তিনি বিভিন্ন কর্মে আবদ্ধ রাখতেন না। তিনি বিজ্ঞানী বলে সেই একটি কক্ষে আবদ্ধ থাকতেন না। সমস্ত জ্ঞানই অবিচ্ছিন্ন একটা প্রবাহ। যেখানে খুশী যখন খুশী অবগাহন করবেন। তৃপ্ত হবেন তাজা থাকবেন।"

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রীতির কথা তাঁর অন্য বন্ধু পশুপতি ভট্টাচার্য যা বলেছেন তা হচ্ছে—

"আমাদের সেই ছাতের আড্ডাতে তাস ও সাহিত্য চর্চা খুবই জমে উঠেছিল। তখন সকলে মিলে ঠিক করা হলো যে নিজেদের মধ্যে একটা হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বের করতে হবে। সত্যেন বসু হবেন তার সম্পাদক। সেই পত্রিকার নাম দেওয়া হল 'মনীষা'। এ নাম সত্যেনেরই দেওয়া। আমরা তাতে লিখতাম, কেউ প্রবন্ধ, কেউ গল্প, কেউ কবিতা। কিন্তু স্বয়ং সম্পাদকের তো কিছু লেখা চাই। সত্যেন বললেন, আমি একটা গল্প লিখেছি।

সেই গল্পের নাম হলো 'কে'। সে যে কে? তার পুরো রহস্যটা লেখক ভাঙলেন না। কেবল বললেন, তাকে চিনেছি, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তাকে ধরবার জন্য আমি গভীর অরণ্যের মধ্যে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি, কখনো রোদে, কখনো ছায়াতে, কখনো অন্ধকারে, তার পায়ের চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, কখনো কখনো গলাও পাচ্ছি, তাকে ধরবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরতে পারছি না। এই গল্পই চলল পাতার পর পাতা, আর মাঝে মাঝে অরণ্য প্রকৃতির কত বিচিত্র বর্ণনা। পড়লে মনে হতো, পুরো একজন কোনো সাহিত্যিকের রচনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গল্প সমাপ্ত হয়নি। কারণ তিনমাস বেরিয়েই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। অতএব লেখক তাঁর মনের মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা এবং কাকেই বা খুঁজছিলেন তা কিন্তু জানা গেল না। এতদিনে পেয়েছেন নিশ্চয় তাঁর খোঁজার বস্তু, অবশ্য সবাই তাই বলে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় নামে (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) বইটি উৎসর্গ করলেন সত্যেন্দ্রনাথকে।

'বিশ্বপরিচয়' রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এক আশ্চর্য অবদান।

বাংলার বিজ্ঞানের বই কেন লিখলেন সেই কথাটা কবি উৎসর্গ পত্রে সুন্দরভাবে লিখেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন, কবিগুরু বাংলায় বিজ্ঞানের বই লিখেছেন। এটাই আমাদের ভাষ্য।

'বিশ্বপরিচয়' বইটি রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের নামযুক্ত করে মুখবন্ধে লিখেছিলেন—

"এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে এমন বিজ্ঞান সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমায় দেবার

যোগ্য। তাছাড়া, অনধিকার প্রবেশে তুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি—হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হলো না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমত নিড়ানি বানিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাই হোক আমার দৃষ্টান্তের যদি কোনো মনীষা, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী দুই অত্যাবশ্যক কর্তব্য কর্মে নামেন, তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।

চিন্তা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।...

আমার কৈফিয়ৎটা তোমার কাছে একটু বড় করে বলতে হচ্ছে, তা হলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।"

এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমি এই বইটি পড়ে আমার মনের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড প্রেরণা লাভ করেছিলাম। জীবনের গোড়া থেকেই মাতৃভাষা ও বিজ্ঞানচর্চার যে প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলাম, কবির স্নেহমণ্ডিত এই উপহার লাভ করে আমি আমার আজীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে কৃতসংকল্প হই।"

সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুগায়ক পণ্ডিত ও লেখক দিলীপ-কুমার রায় বলেছিলেন—

"সত্যেনের সৌম্য মুখে কি একটা মায়া মাখানো থাকত—দেখলে ভোলা যায় না। মানুষকে সে কাছে টানত যেমন সহজে চুম্বক টানে আলপিনকে। ...তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে আমি মাধুর্যের স্বাদ পেয়ে এসেছি দিনের পর দিন। সত্যেন বলতো, ভালোবাসো, ভালোবাসাও। এই আশ্চর্য ভালোবাসার ক্ষমতাই আমি মনে করি

তার ব্যক্তি স্বরূপের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার মতো বন্ধুবৎসল মানুষ আমি কমই দেখেছি।”

সত্যেন্দ্রনাথের 'বিজ্ঞানের সংকট' নামক গ্রন্থটি আমাদের বিজ্ঞান জগতের এক অসাধারণ গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ থেকে সংকলিত করে নির্বাচিত অংশ বিশেষ পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হল—

“নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। এর আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্প-বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদের জন্য কার্যকরী হতে পারে, এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকেরা জড় জগতের অন্যান্য বিষয়-গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখন পর্যন্ত সকল দেশেই শ্রদ্ধা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়মকানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে সাজান যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে, ভবিষ্যতে তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কিনা, এটাই হল গতি বিজ্ঞানের অনুসন্ধান।”

যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তার উল্লেখ করে যা লিখেছেন তা হচ্ছে এই রকমের—

"এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের তারকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট বড় সব জিনিস সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে ও গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ ভাবে মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু' বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে অঙ্ক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে, শত্রুব্যূহের মধ্যে কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যৎবাণী করে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা জড় পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এসব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে আর এক রকম ধাতুর অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।"

প্রাচীনকালে বিভিন্ন জড় পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিজ্ঞানের সংকট' নামক গ্রন্থে এক স্থানে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা হচ্ছে এই রকমের—

"এদিকে আবার প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জড় পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানব মন ব্যগ্র ছিল। বহুদিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়ন শাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান, সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। মাটি পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণিদেহের উপাদানসমূহ সবই ঐ আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণস্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরী করে দেখাচ্ছেন।"

'প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সব জিনিস জন্মায়, কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে, মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে সমস্ত জিনিস তৈরী করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সকলেরই মূলে সেই কয়টি আদি ধাতু আছে এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর দুই সংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে এটি যে মূলত কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সৃষ্টি। পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ুস্বভাব মূলত পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলেছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কিনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ বিরানব্বইটি আদি বস্তুও আবার দুই মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটিন আর ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেকট্রন। প্রত্যেক রকম পরমাণুর মূলেই উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকমের জড় পদার্থের মূলে বিরানব্বইটি আদ্য ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করে আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে, আদি বস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুইটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।"

বিংশ শতাব্দীতে তার প্রতিক্রিয়া কি হল তার প্রসঙ্গ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা হচ্ছে এই—

"বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্ন ধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই সকল মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্কারই আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা নিউটনের গণিত বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন রাস্তায় বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাজির সমাবেশে গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনধারাও তদ্রূপ।

প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভীতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশী।

এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন রাস্তায় ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা ও ইলেকট্রন ঘুরছে।

কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ বহিঃরাস্তার ঋণাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণও একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কণা বলেছি, তাদের পরমাণু গঠনের তারতম্য ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন বিরাজমান।

রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন এবং এই গঠনপ্রণালীর ফলে যে আদি বস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

বিদ্যুৎ ও জড়পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।"

॥ তিন ॥

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করে বলেছেন—

'আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি তখনকার কলকাতার চেহারা ছিল একেবারে আলাদা। আজকের মতো তখন রাস্তায় রাস্তায় বিজলীবাতির বাহার ছিল না। গ্যাসের আলো জ্বলত টিমটিম করে। পাকা ড্রেন তখনো দেখা দেয়নি। রাস্তার গায়ে গায়ে ছিল নর্দমা। ঘোড়ায় টানা ট্রাম মাত্র কয়েকটি প্রধান প্রধান রাস্তায় চলতো মন্থর গতিতে। এত লোকও তখন এই শহরে বাস করত না। চৌরঙ্গী পাড়াকে লোকে বলত সাহেব পাড়া—ঐ দিকটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল দেখতাম। আমাদের ছেলেবেলায় দেখতাম, অনেক সম্ভ্রান্ত বাড়ির বৌ-ঝিরা পালকী চড়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। আমার ঠাকুরমায়ের সঙ্গে আমি একবার পালকী চড়ে বাগবাজারের ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলাম।"

স্মরণ করি ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী ২২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনে সত্যেন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন এক শুভলগ্নে। পিতা সুরেন্দ্রনাথ কাজের তাগিদে বেশীর ভাগই কলকাতার বাইরে থাকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের পরের বছরটি অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে এদেশে বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাস স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছর জগদীশচন্দ্র বসু বেতার (wireless) আবিষ্কার করেন, আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আবিষ্কার করেন মারকিউরাস নাইট্রাট, রসায়নের একটা নতুন যৌগিক পদার্থ।

১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন

গোয়াবাগানের বসু পরিবারে ২২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনে, আর এই বাড়িতেই ১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর এই গৃহে গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের এক মহান মিলন তীর্থ।

সত্যেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, মাতা আমোদিনী দেবীও ছিলেন ন্যায়ও গুণবতী মহিলা। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর মাতা পিতার প্রথম ও একমাত্র সন্তান। ভাই-বোন মিলে তাঁরা ছিলেন সাতজন।

সত্যেন্দ্রনাথের যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন তাঁকে জোড়াবাগানের নর্মাল স্কুলে ভরতি করানো হয়। তারপর গোয়াবাগানে নিজের বাড়ীতে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভরতি হন, এখানে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ার সময় ভরতি হন হিন্দু স্কুলে।

এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"আমাদের সময় হিন্দু আর হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে খুব রেষারেষি চলত। প্যারীচরণ সরকার যখন হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন তখন থেকেই এর নামডাক। সরকারী স্কুল, আর বড় লোকের ছেলেরাই এখানে পড়ত। আর আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের জন্য ছিল হিন্দু স্কুল। রসময় মিত্র ছিলেন হেডমাস্টার, আর অঙ্কের প্রধান শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্রলাল বকসী। আমার স্কুল জীবনের চরিত্র গঠনের প্রাথমিক শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম নিউ ইণ্ডিয়ান ও হিন্দু স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে।

১৯০৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথের এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারেন নি। তাঁর হলো বসন্ত রোগ। সত্যেন্দ্রনাথের মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"বাবারও মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি, ঠাকুর্দা হঠাৎ মারা যাওয়াতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন। তবু

আমাকে আশ্বাস দিয়ে বাবা বলেছিলেন, মন খারাপ করিসনে। এই তো সবে ছাত্র-জীবন শুরু, এক বছর নষ্ট হলে কিছু যায় আসে না।

সত্যেন্দ্রনাথ পিতৃদেবের কথায় উৎসাহিত হয়ে আবার নতুন উদ্যমে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আরো একটা বছর হিন্দু স্কুলেই থেকে গেলেন।

এবার তাঁর পড়াশোনা দ্রুতগতিতে এগোতে লাগল, দিনকালের কৃপায় আমরা দেখতে পাই তিনি আগামী কালের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি পর্ব শুরু করেছিলেন, অর্থাৎ কলেজে গিয়ে তাঁকে অঙ্কের যে সব বই পড়তে হবে, সেগুলি আগেভাগে নিয়ে নিলেন।

শুধু কি তাই ?

সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষা দেবার জন্য একজন পণ্ডিতের কাছে গিয়ে সংস্কৃত কাব্যের পাঠ গ্রহণ করলেন।

এ প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—

সত্যেন্দ্রনাথের মন আগামী বৎসরের পরীক্ষার অপেক্ষায় কেবল পুরনো পড়ায় নিবদ্ধ থাকিতে চাহিত না। কলেজে গিয়া গণিতের যে সব বিষয় পরে পড়িতে হইবে তাহা তিনি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন নিজের চেষ্টায়। সংস্কৃত কাব্যপাঠের মধ্য পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় কালিদাস, ভবভূতি, ভারতী প্রভৃতি কাব্যাবলী পড়িয়া ফেলিলেন। আর পড়িলেন ঐতিহাসিক গ্রীন-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ—'এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দি ইংলিশ পিপল'।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। স্থান অধিকার করলেন পঞ্চম। সত্যেন্দ্রনাথের এই সাফল্যে সকলেই

খুশী হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেই বছর এনট্রান্স পরীক্ষায় ঢাকা কলিজেয়ট স্কুল থেকে মেঘনাদ সাহা নামে একটি ছাত্র পাশ করেন এবং তিনি পূর্ববঙ্গের সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন ও ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

পরবর্তী কালে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ দু'জনে কলেজে মিলিত হল ও দু'জনের বন্ধুত্ব ও প্রীতি সে আরেক ইতিহাস!

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

তিনি নিলেন 'বি' কোর্স।

তাঁর অনুরাগ বিজ্ঞানের প্রতি।

১৯০৯ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্সের শেষ পরীক্ষা। ১৯১০ সাল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন আরম্ভ হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকেই শুরু হল তাঁর গৌরবময় জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আই. এস্-সি'র ছাত্র হিসাবে ভরতি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সহপাঠী হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ যাঁদের পেয়েছিলেন, তাঁরা হলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিল রঞ্জন সেন, পুলিন বিহারী সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দকে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষক গোষ্ঠীদের মধ্যে ছিলেন পার্সিভাল, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ইংরাজী), বঙ্কিম দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কলিন্স, ডি. এম. মল্লিক (গণিত), জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (পদার্থ বিজ্ঞান) আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (রসায়ন)।

জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিয়ে ছাত্রমহল বিশেষ

আলোড়ন মনে করতেন। তাঁরা এঁদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন।

সত্যেন বসু এনট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন, তাই প্রেসিডেন্সীতে তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে।

সত্যেন্দ্রনাথের এক সহপাঠী বলেছেন—

"আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হই, তখন পরস্পরের মধ্যে কোন আলোচনা না করেই বিজ্ঞানের সেবা করব এই প্রতিজ্ঞা করি। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে আমরা মানুষ হই। দেশপ্রেম আমাদের মধ্যে প্রবল ভাবেই ছিল। আমরা বিজ্ঞান অধ্যাপনা ও গবেষণা করব স্থির করেছিলাম ও কাজেও তা করেছি। আমাদের মধ্যে পাঁচজন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হয়েছি।"

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কি রকম গভীর ছিল তা বলার নয়।

তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন পার্সিভাল সাহেব অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহপাঠীদের অনুরোধ রক্ষা করলেন পার্সিভাল সাহেব।

পার্সিভাল বি. এ. ক্লাসের নীচে পড়াতেন না।

কিন্তু ছাত্রদের অনুরোধ তিনি রাখলেন।

সে বছর আই. এস্-সি'র টেস্ট পরীক্ষায় নিজে থেকেই ইংরেজী ছাড়াও অংক পরীক্ষা করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ একশোর মধ্যে ষাট পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সত্যেন্দ্রনাথের খাতার ওপর তিনি মতামত দিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ অসাধারণ ছাত্র। একে আমি ষাট নম্বর বেশি দিলাম।

আই. এস-সি. পরীক্ষায় সতেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—

"আমি যখন স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, সত্যেন্দ্রনাথ তখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে। কিন্তু তখনই আমায় দিলেন তাঁর পড়িবার ঘরে অবাধ স্বাধীনতা।......স্কুলের পড়ার যখন যতটুকু দরকার, তাতে আর কতটুকু সময় লাগিত। বাকী সময়ের কাজ ছিল দাদার সঙ্গে গল্প করা, তাঁর অবসর মতো। এই গল্প আলোচনার ভিতর দিয়াই আমার প্রকৃত শিক্ষা। আমার ধারণায়, দাদা সেই প্রকৃতির লোক যাঁকে বলা যায় 'জাত মাস্টার'। কোনো কিছু পড়িয়া ভালো লাগিলে তা তখনই আমায় বোঝাইতেন। যে কোন বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর অনন্যসাধারণ। কেবল আমি নই, সেই সময়ের কত ছাত্র তাঁর কাছে আসিয়া পড়া বুঝিয়া নিত তা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁর নিজের পড়া যে কখন করিতেন, বোঝাই যাইত না। আসল কথা তাঁর নিজের পড়া তিনি আগেই শেষ করিয়া রাখিতেন। কলেজের ক্লাসগুলিতে হইত তাঁর রিভিসনের কাজ ......তবে উদাত্ত কণ্ঠের মেঘদূত হইতে আবৃত্তি আমি অনেকবার শুনিয়াছি। আর দেখিয়াছি হিস্টোরিয়ানস্ হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড সিরিজের ফরাসী দেশের ইতিহাসের বিপুল গ্রন্থ এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতেন। জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টায় তিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও মানবিক শাস্ত্র ইহার কোন বিভাগকেই তিনি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। শারীরিক কুশলতায় তিনি সব্যসাচী, কেননা, লেখার ও খাওয়ার প্রচারে তিনি দক্ষিণ

হস্তের ব্যাপারে সুদক্ষ হইলেও একটা পেনসিল ধরিতে গেলে তাঁর বাম হস্ত আগাইয়া আসে। ক্যারম, ব্যাটমিণ্টন ও টেনিস খেলাতেও তিনি বামপন্থী। ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এস্-সিতে দাদাই প্রথম হইলেন। কিন্তু তাঁর বি. এস্-সি. পরীক্ষার একটি দিনের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এই সময়ে হেদুয়া পুকুরের একটি কোণে এবং যেখানে ন্যাশানাল সুইমিং ক্লাবের প্যাভিলিয়ন, শীতের শেষে ও পরীক্ষা-পর্বের অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন কলেজের কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছাত্রদের একটা মণ্ডলী জমায়েত হইত প্রতি সন্ধ্যায়। এই মণ্ডলীর কেন্দ্রে ছিলেন সত্যেন বোস। ম্যাট্রিক দেবার পর আমিও যোগ দিতাম। তার আগে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমাকে বিকালে খেলাধূলার পর বাড়িতে ফিরিতে হইত। গ্যাসের বাতি জ্বলার আগে—মায়ের কড়া হুকুমে। ম্যাট্রিক দিবার পর হেদুয়ার আড্ডা হইতে সন্ধ্যায় উঠিয়া পড়িতেছি দেখিয়া দাদার প্রশ্ন—কোথায় যাচ্ছিস ? উত্তর দিলাম—বাড়ী। দাদার নির্দেশ আসিল—'বোস। দেরী হলে একদিন বকুনি খাবি, দ্বিতীয় দিনও খাবি। তারপর থেকে কেউ আর বকবে না।' জীবনে এই আমার প্রথম মুক্তির আস্বাদ বাড়ীর শাসন হইতে। কিন্তু দাদার মুক্তির আদেশে শাসনের বাঁধনও কম ছিল না। সপ্তাহে তিনদিন শ্রমজীবীদের নাইট স্কুলে পড়াইতে যাইতে হইত। সন্ধ্যায় আড্ডা মারিয়া আটক থাকিবার জো ছিল না। বি. এস্-সি. পরীক্ষায় গণিতে অনার্সের পালা চলিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থী। সে তখন প্রায় খালি গায়ে একটা চাদর চড়াইয়া আসিত। প্রথম দিনের পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ? সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। চারদিকে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের দেখা নেই। আমি ভাবিতেছি, একবার তার বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া আসিব কিনা! এমন সময় দেখা গেল দাদাকে। তার এমন বিশীর্ণ বিষণ্ণ চেহারা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমরা নির্বাক হইয়া

চাহিয়া আছি দেখিয়া সেই-ই বলিল, 'আমি সব কটা অঙ্ক কষতে পারিনি। এই প্রথম পরীক্ষার হল থেকে অঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। কী শুষ্ক, করুণ শোনালো তার কণ্ঠস্বর। পরে জানা গেল, কেম্বি_জের সিনিয়র বাংলা বিভাগের সাহেব এমন কঠিন ও শক্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেছিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও তিন ঘণ্টার মধ্যে ৭৮ নম্বরের বেশী উত্তর করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইহার বিপরীতে একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় এম. এস্-সি. পরীক্ষার ফল প্রকাশে। প্রেসিডেন্সী কলেজের কমনরুমে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি দাদা সেখানে।...... জানতে পারা গেল সে আসিয়াছে ইউনিভারসিটি অপিসে মার্কশীট নিতে। খুলিয়া দেখি অবাক কাণ্ড। আটটি বিষয়ের ছুটিতে ফুল মার্কস, আরও ছু'একটিতে ৯৬-এর কাছাকাছি। সবচেয়ে নীচু নম্বর ৮৮।"

আই. এস্-সি. পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠলেন, তখন থেকে সহপাঠী হয়ে এলেন মেঘনাদ সাহা। ছুজনেই গণিতে অনার্স নিলেন। ছু'জনের মধ্যে স্থাপিত হল বন্ধুত্ব। তা অক্ষুণ্ণ রইলো চিরদিনই।

১৯১৫।

এম. এস.-সি. পরীক্ষা দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম হলেন।

আর মেঘনাদ হলেন দ্বিতীয়।

বিজ্ঞান বিষয়ের সব পরীক্ষাতেই জয়ী হয়ে হয়ে এসেছেন সত্যেন্দ্রনাথ।

এর পর কি করবেন তিনি ?

সত্যেন্দ্রনাথ যখন এম. এস-সি'তে প্রথম হয়েছে—নিশ্চয় কোন ভাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকবে।

কিন্তু আমি ?

সেদিন কেউ তাকে ডাকল না।

অগত্যা কি করবেন ভেবেই চলেছেন।

॥ চার ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বসেছিলেন নিজের ঘরে।

এমন সময় তাঁর এক বন্ধু এসে হাজির।

বললেন, সত্যেন, একটা প্রাইভেট টিউশনি আছে। করবি?

—কোথায়?

—আসাম গৌরীপুরের জমিদারের ছেলেকে পড়াতে হবে। সপ্তাহে তিন দিন। মাইনে মাসে দুশো টাকা। আই. এস্-সি. ক্লাসের ছাত্র।

সত্যেন্দ্রনাথ রাজী হলেন।

এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা হচ্ছে—

'পাশ করার পর প্রথম একটা বছর আমি টিউশনি করে কাটিয়েছি। এই সময়ে বাইরের দু' একটা কলেজে ও অন্যান্য সরকারী অফিসেও চেষ্টা করেছিলাম। যাকে পড়াতাম সে এখন সিনেমা জগতের দিকপাল কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। পাটনা কলেজে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। উলসন সাহেব তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। স্যার যদুনাথ সরকার তখন সেখানে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে আমার চাকরী হলো না। তাঁরা জানালেন, তাঁদের দরকার একজন সেকেণ্ড ক্লাস এম. এস-সি.। তখন ভাবলাম, বোধ হয় ফার্স্ট ক্লাস না লয়ে সেকেণ্ড ক্লাস পেলেই বুঝি ভালো হত। আর একবার বাবার এক বন্ধুর কথায় আলিপুরে হাওয়া অফিসে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। জবাব এলো—বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একজন কৃতী ছাত্রের উপযুক্ত কোনো চাকরী এখানে খালি নেই। প্রার্থী অন্য কোথায় দরখাস্ত করলে ভাল হবে।

দেখতে দেখতে এমনি করে দু'বছর কেটে গেল।

এমনি সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা চিঠি এলো সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। তাতে লেখা আছে—পত্রপাঠ উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করবেন। স্যার আশুতোষ তখন উপাচার্য।

সত্যেন্দ্রনাথ যথাসময়ে এলেন।

উপাচার্য বললেন, তোমার মার্কস আমি দেখেছি। তুমি মিশ্র গণিতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিলে? সায়েন্স কলেজে তোমাকে লেকচারার নিযুক্ত করতে চাই। তোমার এ বিষয়ে কি মত বল।

'এ তো আমার সৌভাগ্য'—বিনীতভাবে বললেন সত্যেন্দ্রনাথ।

—কিন্তু তার আগে একটা বছর তোমাদের তৈরী হতে হবে।

১৯১৭ সালে ইউনিভারসিটি সায়েন্স কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়াও মেঘনাদ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সায়েন্স কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

শুরু হল নতুন জীবন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষ যখন বিজ্ঞান কলেজের শিলান্যাস করেন তখন বিজ্ঞান জগতে এসে গিয়েছে নব্য পদার্থ বিজ্ঞান আর আধুনিক গণিত।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকের শ্রেণীতে যাতে এই দুইটি বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় সেইজন্য ১৯১৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ আর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ স্যার আশুতোষের কাছে এই প্রস্তাব দিলেন।

স্যার আশুতোষ তখন এঁদের এক বছরের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

১৯১৭ সালে আশুতোষ এই অসাধ্য সাধন করে এক নতুন ইতিহাস রচনা করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ আর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তিনজনে একই সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তখন এখানে রসায়ন আর পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল মিত্র, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন ও যোগেন্দ্রনাথ বসু। স্যার আশুতোষের অনুরোধে প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন।

১৯১৭ সালটি বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই বছরই জগদীশচন্দ্র বসুর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' (Bose Institute) স্থাপিত হয়েছিল।

সেই থেকে ভারতে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

নতুন উৎসাহ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আর মেঘনাদ বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষকতা কাজে নিজেদের উৎসর্গ করলেন।

উচ্চতর পদার্থ বিদ্যার 'পঠন-পাঠন' ও গবেষণায় তাঁরা নিজেদের প্রতিভাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলেন।

তাঁদের মিলিত চেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপে গ্যাসীয় অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হল বিলাতের একটি ইংরেজী পত্রিকায়। পত্রিকাটির নাম 'ফিলোসাফিক্যাল ম্যাগাজিন'।

এই সময়ে বিজ্ঞান জগতে এলো আলোড়ন। এই প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ যে সূত্র প্রমাণ করেন সেটি 'সাহা-বোস' সমীকরণ নামে সুপরিচিত।

এই সময় বিজ্ঞান জগতে তুমুল আলোড়ন নিয়ে এসেছে আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory Relativity)। সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ দুই বন্ধু মিলে এই আপেক্ষিক তত্ত্বের কয়েকটি মূল প্রবন্ধ জার্মান থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৯২০ সালে এই প্রবন্ধগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

এটাই ছিল সেদিন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ।

১৯২৬ সাল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ ছেড়ে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার রীডার (Reader) হিসাবে যোগদান করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে এখানকার পদার্থ বিদ্যার বিভাগটি নতুন করে গড়ে তোলেন।

১৯২৩-২৪ সালে অধ্যাপনার আসরে গবেষণায় মন দিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ জার্মানিতে মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। ৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ—প্রবন্ধ ঠিক নয়, একটা সমীকরণ। এটি যখন আইনস্টাইনের কাছে এলো তখন তিনি এটা পড়ে চমকে উঠলেন। কে এই সত্যেন বসু ? তবুও প্রবন্ধটির গুরুত্ব বুঝে তিনি বুঝলেন এটি একটি মৌলিক গবেষণা। সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন সেটি জার্মান ভাষায় তর্জমা করে জার্মানির একটা বিশিষ্ট পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথকে জানালেন তাঁর মতামত। যথা-সময়ে প্রবন্ধটি ছাপা হলে সত্যেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন জগৎ বিখ্যাত।

আইনস্টাইনের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠাইবেন। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম হবে। তখন তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের য়ুরোপে যাওয়ার সমস্ত দায়িত্ব নিলেন।

আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭২-১৯৫৫)—সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, 'আমি তাঁর একলব্য শিষ্য।' আজীবন তিনি তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন।

বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সাধনার পটভূমিকায় আইন-স্টাইন অনেকখানি ডুবে ছিলেন এ বললে অত্যুক্তি হবে না।

এই প্রসঙ্গে সেই মহাবিজ্ঞানীর জীবন কথা বলতে গিয়ে প্রখ্যাত কাহিনীকার বলেছেন—

"আইনস্টাইন সেই মুষ্টিমেয় মানুষদের মধ্যে একজন যাঁদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী পথে অনেক দূর অনেক শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত। যুগান্তকারী আপেক্ষিক তত্ত্বটি তিনি যখন আবিষ্কার করেন তখন আইনস্টাইনের বয়স ছিল মাত্র ২৬ বৎসর। এই শতাব্দীর সূচনা কালে বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন যখন তাঁর নবীন প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন তখন থেকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে চিরদিনের মতো মুছে গেল নিউটনের জগৎ; আর সেইখান থেকে দেখা গেল এক নতুন পৃথিবী—আইনস্টাইনের পৃথিবী।"

॥ পাঁচ ॥

জীবন দর্শনের প্রকৃত প্রেমিক সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর জীবন দর্শনের মূল মন্ত্র ছিল সবার উপরে মানুষ সত্য।

মানুষই চরম ও পরম সত্য—একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশেষভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলতেন, "আমাদের দেশের এক প্রাচীন কবির এই বাস্তব জীবন-বোধকে একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ আমি এই আদর্শের মধ্যে দেখতে পাই। যে সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি মানুষকে অপমান করে বা যা কিছু মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী তা আমি কোনদিনই সমর্থন করিনি।"

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর যুক্তি ও চিন্তা দিয়ে আমাদের বলেছেন এই যে—

"আমি যে আমার নিজের দেশকে ভালবাসি না তা নয়, তবে আমি এই বলি যে, ভালবাসা যদি এমন রূপ নেয় যাতে পদে পদে সত্যের অপলাপ করতে হয়, তা হলে সে ভালবাসার দাম নেই। যাকে গ্রহণ করতে হবে, যার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তার যদি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি গুণ বলে বর্ণনা করি তা হলে সে কাব্যের জগতেই চলে। মানুষের মধ্যে সেই মনোভাব আনা খুব কঠিন।"

'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস'—এই কথা সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, আর আমাদের কাছে তিনি তুলে ধরেছেন এক মহা সত্যের বাণী। তিনি বলতেন—'আমি তাই মনে করি জীবন দেবতার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তার চর্চা ও অনুশীলন নিভৃতে দরকার। তার

ভেতর থেকেই মানুষ হয়ত পাবে তার প্রতিদিন কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা। বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশ ওপরের দিকে চলেছে। তার সভ্যতা ঊর্ধ্ব পথে চলেছে, এটা বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি নিছক কল্পনার ওপর নির্ভর করে মানুষের জয় রথ এগোয় না।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সুগায়ক কবি ও মনীষী দিলীপকুমার রায়ের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল, যদিও দু'জনের পথ ছিল আলাদা, মনের দিক দিয়ে ছিলেন এক সুরে বাঁধা।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে মনে করে দিলীপকুমার রায় তাঁর এক কবিতায় লিখলেন—

'নাস্তিবাদী নও তুমি জানি—কিন্তু থাক আজ
আজ তব শুভ জন্মদিনে এ বৃথা বিতর্কে কি বা কাজ ?
আজ শুধু চাই বন্ধু তোমার দানের অঙ্গীকারে
তোমারে অভিনন্দিবে স্মৃতির মঞ্জুল উপচারে।
মনে পড়ে মৃদুভাবে স্নিগ্ধ হাসি ঝরায়ে তোমার
করেছ আমার ভাষা উদ্দীপ্ত তুমি কত বার।
কত বার হৃদয়ের দুঃখ ব্যথা তোমারে জানায়ে
পেয়েছি নবীন আশা ভরসা তোমার স্নেহচ্ছায়ে।
কত নব দ্বিধার সংশয়ের গ্রন্থি করেছ মোচন,
দিয়ে সান্ত্বনা তব দরদী প্রবোধে কাণে ঘন।
পথ আমাদের ভিন্ন তবু লক্ষ্য এক—অদ্বিতীয়,
সত্যের সাধনা গণি উভয়েই চিরস্মরণীয়।

—দিলীপকুমার রায়

বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রেরণা পেয়েছিলেন কি করে ?

তাঁর এই ঐকান্তিক প্রয়াস এলো কি করে তার সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা হচ্ছে—

"এই বিষয়ে আমি প্রেরণা পেয়েছি চারজনের কাছ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—এঁরাই আমাকে এই দিকে পথ দেখিয়েছিলেন। আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গে বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি পড়ি তখন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাংলাকে বৈজ্ঞানিক করতে হলে, বাঙালীকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শেখাতে হবে—বঙ্কিমবাবুর এই কথা কয়টি আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। ১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার সময় আগাগোড়াই বাংলায় যে উদ্বোধনী ভাষণটি রচনা করে পাঠ করেছিলেন তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'নিবেদন'। তাঁর সেই বক্তৃতা আমাকে এই দিকে উপকৃত করেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই আমাদের দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন। তিনি বলতেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে ও বিজ্ঞান চর্চা না করলে বাঙালীকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা যাবে না। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেই আমি এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম যে, আমাদের মাতৃভাষাকে উচ্চতর বিজ্ঞান আলোচনার বাহন করবার জন্য আমি আত্মনিয়োগ করব। আমার দু'জন শিক্ষকই জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র—এই ভাবের ভাবুক ছিলেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই থেকে সহজেই অনুমেয়—তাঁর সাধনার ফল স্বরূপ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। এটা তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ।

পরের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে খুব কম লোকেই পারে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—

'আমার সমসাময়িক বন্ধু পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পরে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। পুণ্যেন্দ্রনাথও সত্যেন্দ্রনাথকে বড় ভাই-এর মতো শ্রদ্ধা করতেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ পুণ্যেন্দ্রনাথের মস্তিষ্কের বিকৃতি হতো। এ অবস্থায় তাঁকে সামলানো খুবই মুশকিলের ব্যাপার ছিল। কতবার দেখেছি তাঁর এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পারিবারিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বাড়ীতে এনে শুশ্রূষা করতেন, নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন।'

মানবদরদী সত্যেন্দ্রনাথ।

তাঁর দরদী অন্তরে সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখেছেন। ছোট বড় সবাই ছিল তাঁর আপন জন।

দাতা হিসাবেও কি তাঁর দান কম? তাঁর হৃদয় ছিল করুণা-ধারায় প্লাবিত।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র খাস্তগীর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দানের সাগর বলা হয়। আমাদের সত্যেন্দ্রনাথকেও ঐ রকম আখ্যা দিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ছাত্র, শিক্ষক, বন্ধু, বান্ধব ও দেশের দুঃস্থ কত লোককে যে তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন তার শেষ নেই। নিজের কথা তো তিনি ভাবেনই না, নিকট আত্মীয়দের কথাও তিনি চিন্তা করেন কিনা সন্দেহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খয়রা' অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৯৪৫ সনে যখন তিনি ঢাকা ছাড়েন, সেই সময়কার একটি কথা আজও আমার মনে পড়ে। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে তাঁর ঘরে যখন ফিরে এলেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" তিনি তাঁর

সরল হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আমার ব্যাঙ্কে গিয়েছিলুম, সব লাল আজ কালো করে এলুম।' বুঝতে বাকী রইল না যে তিনি তাঁর ব্যাঙ্ক শূন্য করে কত লোককে কত উপকার করেছেন…"

সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ-ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রাবন্ধিক ডক্টর পঞ্চানন চক্রবর্তী তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ-ভালোবাসা শুধুমাত্র মানুষের প্রতি বর্ষিত হতো না, জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর স্নেহ কম ছিল না। তাঁর পোষা একটি কুকুর ও দুটি বিড়াল ছিল। একটি বিড়ালের নাম ছিল কেনো। অপরটির নাম গদা। সত্যেন্দ্রনাথ তাদের আদর করতেন, খাবারের ভাগ দিতেন। তাদের জন্য প্রতিদিন মাছের ব্যবস্থা ছিল। তারা স্বচ্ছন্দে তাঁর বিছানায় শুয়ে প্রচুর আদরের স্পর্শ লাভ করে পুলকিত চিত্তে তাদের মোটা লেজ দিয়ে তাঁর হাত ছুঁয়ে নিজেদের সান্নিধ্য জানিয়ে দিত।"

কোমল হৃদয়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বজ্রকঠোর সত্যনিষ্ঠ। জীবনে কোনোদিন কোনো অবস্থায় তাঁর সত্যনিষ্ঠার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। সত্যরক্ষার জন্য স্পষ্ট কথা বলতে তিনি কখনো দ্বিধা বোধ করেন নি। যা সত্য বলে তিনি মনে করেছেন তা থেকে কেউ কোনোদিন তাঁকে টলাতে পারেনি। তাই মনে হয় তিনি সার্থকনামা পুরুষ ছিলেন। 'যা সত্য বলে মনে হয়েছে আজীবন তাই করার চেষ্টা করেছি'—তাঁর এই একটি কথার মধ্যে আমরা সত্যনিষ্ঠ মানুষটির যেন সম্পূর্ণ মূর্তি দেখতে পাই।

সত্যেন্দ্রনাথের এক ছাত্রী ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায় মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

বিজ্ঞান কলেজে থাকাকালীন বহু ঝড়ের সম্মুখীন আমি হয়েছি। কিন্তু অধ্যাপক বসু সকল সময়ে তাঁর পক্ষপুটে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে আমি পিতৃহীন হলাম, আর ঠিক চারমাস পরে আমার স্বামী চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। এই মর্মান্তিক দুঃখের দিনে তিনি পিতার স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি তাঁর অপার পিতৃস্নেহে আমায় মানসিক শান্তি দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে প্রগাঢ় স্নেহ পেয়েছি। আমার স্বামীও সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হননি। তাঁর সঙ্গে সকলের এক অদ্ভুত আত্মিক যোগ ছিল। তাই সকলকে তিনি আপন করে নিতে পারতেন। তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পুত্র-কন্যার মতো ভালবাসতেন।

সত্যসাধক সত্যেন বসুর বিস্ময়কর জীবনের কি শেষ আছে? পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর বিদেশে যাত্রা নিয়ে আলোচনা করব।

॥ ছয় ॥

বিজ্ঞানীরা বলেন, গ্যালিলিওর আবিষ্কারের পরে বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন এক স্মরণীয় নাম।

গণিত শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের এই যাদুকর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের এককালের ধ্যান-ধারণা বদলিয়ে দিয়েছেন, আর উদ্বোধন করে গিয়েছেন এক নতুন পরমাণু যুগের।

আইনস্টাইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার মিলিত রূপ।

তাঁকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে এক নির্ভীক মহাপথিক।

আপেক্ষিক তত্ত্বের পর তাঁর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব পারমাণবিক শক্তি বিকাশের ভিত্তি রচনা করে গিয়েছিল, বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে এ সত্য আজ স্বীকৃত।

দক্ষিণ জার্মানির উলম শহরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন আইনস্টাইন এক সঙ্গতিসম্পন্ন ইহুদী পরিবারে। পিতা ছিলেন এঞ্জিনীয়ার। মায়ের প্রতিভার প্রকাশ ছিল গানে—বীটফোনের গানে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

মায়ের এই প্রতিভা পুত্র আইনস্টাইন পেয়েছিলেন এবং ছয় বছর বয়সেই তিনি বেহালা বাজাতে শেখেন।

সেই থেকে মহাবিজ্ঞানীর সমাজ জীবনের সাথী ছিল বেহালা। বেহালা ছিল তাঁর চিত্তবিনোদনের উপকরণ।

ছাত্রজীবনের দর্শনেও তাঁর অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। পনের বছর বয়সেই তিনি বিজ্ঞানের যাবতীয় বই পড়ে শেষ করেছিলেন। সতের বছর বয়সে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে জুরিখ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁর প্রধান বিষয় ছিল পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্র।

তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন জুরিমের একটা স্কুলে শিক্ষকের কাজ করতেন।

স্নাতক হওয়ার পর একটা পেটেন্ট অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন আইনস্টাইন।

১৯০৫ সালে বার্লিনের একটা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ত্রিশ পাতার একটি প্রবন্ধ বেরুল। লেখক—আলবার্ট আইনস্টাইন। সেই প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞান জগতের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের বার্তা নিহিত ছিল। যে অবিষ্কারের ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন ও জড় পদার্থের গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘকালের ধ্যানধারণা আজ বদলিয়ে গিয়েছে।

১৯২০ সালে যখন ইংরেজী ভাষায় ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তখন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান মহলে, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞানী ও গাণিতিকদের মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল তাঁর মতবাদ।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু সহজে মেনে নিতে পারলেন না আপেক্ষিক তত্ত্ব। বললেন, অত্যন্ত প্রমাণ চাই। সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল হিরোশিমাতে চল্লিশ বছর পর। এর ফলে থেমে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ভারত সাধক বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই মহাবিজ্ঞানী আইন-স্টাইনকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে ইউরোপ যাত্রা করলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

প্রথমে এসেছিলেন প্যারিসে।

এখানে এসে ভারতীয় ছাত্রদের একটা মেসে তিনি উঠলেন।

প্যারিসে এসেই কয়েকদিনের মধ্যে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক সিলভা নেডির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল।

অধ্যাপক সিলভা নেডি রবীন্দ্রনাথের ডাকে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন।

সত্যেন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ হলেন অধ্যাপক নেডি। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে বিশ্ববন্দিতা মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। শুধু তাই নয়, তিনি একখানা পরিচয় পত্র লিখে দিলেন মাদাম কুরীর কাছে।

মাদাম কুরী তখন বৃদ্ধা।

সত্যেন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ হলেন।

ভারত বিজ্ঞানীকে তিনি সাদরে বরণ করলেন। মাদাম কুরী বললেন, তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু কাজ করার আগে তোমাকে ফরাসী ভাষা শিখতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, আমি ফরাসী ভাষা জানি মাদাম।

—বেশ। কাল থেকে আমার ল্যাবরেটরিতে এসো।

সত্যেন্দ্রনাথ মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরিতে এলেন।

এখানে কিছুকাল তেজস্ক্রিয়তা (Radio Activity) সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের একাগ্রতা ও কাজের কুশলতা দেখে মাদাম কুরী বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন সত্যেন্দ্রনাথকে।

প্যারিসে সত্যেন্দ্রনাথ ছয়মাস ছিলেন। এই সময় বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞানী ড্য ব্রোয়ীর গবেষণাগারে রঞ্জন রশ্মি (X-Ray) সম্পর্কে কিছুকাল কাজ করেন।

ফ্রান্সে থাকার সময় বিশিষ্ট পদার্থবিদ লাঙ্গ্যাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই সময়ে তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। তিনি আইনস্টাইনকে একটা চিঠিতে তাঁর মনের কথা লিখে জানালেন। জানালেন—আমি দু বছরের ছুটি নিয়ে ইউরোপে এসেছি। জার্মানিতে গিয়ে আপনার অধীনে আমার কাজ করার খুবই ইচ্ছা। আপনি যদি যাবার অনুমতি দেন, তাহলে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করব।"

এই চিঠিতে তিনি মহাবিজ্ঞানীকে আচার্য (Master) বলে সম্বোধন করেছিলেন।

চিঠি এলো যথাসময়ে।

আইনস্টাইন অন্যান্য বিষয়ে উল্লেখ করার পর ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানালেন।

শুধু কি তাই ?

আরও জানালেন, তাঁর অধীনে গবেষণা করার জন্য সব রকমের সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

চিঠি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মনে আর আনন্দ ধরে না। তাঁর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"বার্লিনে এসে একটা হোটেলে উঠলাম। সেখান থেকে ফোনে যোগাযোগ করি আইনস্টাইনের সঙ্গে। তাঁর কথায় আন্তরিকতার যে সুর বেজে উঠেছিল তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি তখন থাকতেন পাঁচ নম্বর হাবারল্যাণ্ড স্ট্রীটের একটা বাড়ীতে। পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ এসে পৌঁছলাম সেখানে। দরজার কাছে একজন পরিচারিকা দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে আমার নামের কার্ডখানা দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এসে সহাস্য মুখে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে একটা ঘরে নিয়ে গেলো। ঘরে গিয়ে দেখলাম তাঁর টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত বই ও কাগজপত্র রয়েছে, আর এক কোণে রয়েছে তাঁর

বেহালাখানি। এক নজরেই দেখলাম মানুষটি প্রিয়দর্শন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা মিষ্টতা ছিল যা সকলকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত। অতি সযত্নে ছাঁটা ঘন কৃষ্ণবর্ণের গোঁফ। মাথার ওপর পরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত একরাশ কালো চুল, আইনস্টাইনের চেহারাতে এই দুইটি ছিল লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধারণের মধ্যে মানুষটি যে একজন অসাধারণ এটা শুধু বুঝতে পারা যেত তাঁর আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকালে, সেই চোখের দৃষ্টিতে ছিল চিন্তার গভীরতা, আর বিশ্বের রহস্য উদঘাটনের একটা গভীর ব্যগ্রতা।”

তারপর এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ আরও যা বলেছেন তা হচ্ছে এই ধরনের—

“প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে আমাদের দু’জনের মধ্যে যে সমতুল্য ঘনিষ্ঠতা হয় তা ১৯৪৫ সালের আইনস্টাইনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হত ফরাসী ভাষায়। আইনস্টাইন নিজে জার্মান হলেও ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন ও লিখতেন। তাঁরই মাধ্যমে আমি অনেক নামকরা বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। অনেক কিছু দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বার্লিনে বিজ্ঞানীদের একটা আলোচনা চক্র ছিল। আইনস্টাইনের চেষ্টায় আমি সদস্য হতে পেরেছিলাম। তাঁর দেওয়া পরিচয়-পত্রের জোরে আমি অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, সেখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেও বিনা জমায় বই আনতে পেরেছিলাম।”

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নিবিড় স্নেহ-ভালোবাসা পেয়ে বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে এলো এক নতুন আলোর শিখা!

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

ঢাকা থেকে তাঁর বন্ধুদের লেখা একটা চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন তিনি যেন অবিলম্বে আইনস্টাইনের একটা সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার জন্য একটা দরখাস্ত করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এম. এস্-সি.। তাঁর কোন ডক্টরেট উপাধি ছিল না। আর ডক্টরেট ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়া খুব দুঃসাধ্য। তবে আইনস্টাইনের সুপারিশপত্রের দাম অনেক। তাই তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এই বলে চিঠি দিয়েছিলেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পরিচয়তে তিনি নিজেই একক। কারো সুপারিশ বা অনুগ্রহে তিনি বড় হবেন এ কথাও তিনি ভাবতেন না কোন সময়েই।

প্রথমে সংশয়, পরে সংকোচ, কেমন করে তিনি বলবেন মহা-বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে সুপারিশপত্র লিখে দিতে হবে।

চিন্তার পর চিন্তা।

অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথ সুপারিশের কথা তুললেন। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করেছ সেই তো তোমার আসল পরিচয়।

পরে অবশ্য আইনস্টাইন একটা প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

এবার ঘরে ফেরার পালা।

ইউরোপে থাকাকালীন তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন।

সঙ্গে ছিল মহাবিজ্ঞানীর প্রশংসাপত্র। স্বয়ং আইনস্টাইনের স্বাক্ষরযুক্ত সেই চিঠি।

তাতে লেখা ছিল: 'আমরা সবাই প্রোফেসর বোসের উপস্থিতিতে উপকৃত হয়েছি।'

সত্যেন বসু নিযুক্ত হলেন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকে ঢাকা হলের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

১৯২৭ সাল থেকে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকায় ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের গৌরবময় যুগ। তাঁরই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির সোপানে পৌঁছে গেল।

নবীন ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে নতুন গবেষণা।

সত্যেন্দ্রনাথের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে।

শুধু ভারতে নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও।

সত্যেন্দ্রনাথ কি শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন?

না। তিনি ছিলেন এক অনন্য অসাধারণ ব্যক্তি, যার তুলনা হয় না।

এ প্রসঙ্গে সমালোচক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'জীবন দর্শনে সত্যেন্দ্রনাথ' বলতে গিয়ে আমাদের যা জানিয়েছেন তা হচ্ছে এই—

"বিজ্ঞান জগতে অনন্যসাধারণ আবেদনের দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ যেমন নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, তেমনি তাঁর স্বদেশবাসীর

সামনে তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন এক মহৎ ও সার্বজনীন চরিত্রের অম্লান আদর্শ। যে প্রতিভা একদিন তরুণ বয়সে বিশ্বরহস্যের মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করে বিজ্ঞান জগতে অসাধ্য সাধন করেছিল, আমরা দেখলাম, পরিণত বয়সে সেই প্রতিভাই আত্মসমাহিত জ্ঞান তপস্বীর পরম উদারতায় ছোট বড়ো নির্বিশেষে তাঁর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে টেনে নিয়ে গুরু-শিষ্য মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করল।

আবার অন্য দিক দিয়ে সেই প্রতিভা স্বজাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছে। যাঁরা তাঁর জীবনেতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করবেন তাঁরা দেখতে পাবেন সত্যেন্দ্রনাথের সকল সাধনার পিছনে ছিল স্বদেশের গৌরব বর্ধন করার একটা আকাঙ্ক্ষা, আর তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা সর্বদা বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। জাতীয় মহত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন। সেই মহত্ত্বের সাধনাতেই সার্থক সত্যেন্দ্রনাথের জীবন। নব ভারতের সর্বসাধনার মধ্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।"

স্মরণ করি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের চিরন্তনী সেই জীবনদর্শন। আর স্বদেশ কল্যাণের কথা তিনি যা বলেছেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম—

"ভারত বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতার পর তাহার রাষ্ট্রশক্তি ও ধনশক্তি হারাইয়া অতি হীন, দুর্বল, বিপন্ন জীবন যাপন করিতেছিল, সুতরাং জাতীয় জীবনের এই প্রাথমিক বা আদিম প্রয়োজনের দিকে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনায়কদের প্রথম দৃষ্টি পড়াই স্বাভাবিক।

"তা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য জাতীয় জীবনের আদর্শ ও শক্তির সংস্পর্শে তাহার বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গিতেছে বলিয়া স্বভাবতই পাশ্চাত্ত্যের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনকেই সে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া চলিতেছে। ভারতীয় মানবধর্মের কথা বিশেষ ভাবিতে অবসর বা আগ্রহ বোধ করে না।

"তবু স্বভাবতই ইহা ফল্গুধারার ন্যায় জাতীয় জীবনের প্রবহমান বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতাগণের প্রবর্তিত মানবীয় ধর্মান্দোলনে ভারত রাষ্ট্রের এক পার্শ্বে এক একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

"সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও ভারত মানবধর্মনিরপেক্ষ নয়। কিন্তু এই মানবধর্ম যে কি সে বিষয়ে বহু শতাব্দীর অনভ্যাস বশে ঠিকমতো প্রয়োগ হইতেছে না।

"বুদ্ধদেব অহিংসার মন্ত্রের প্রচারক হইয়াও যে সেনাপতি সিংহকে ন্যায় ও মানবধর্মের ভিত্তিতে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন সে কথা কাহারও মনে আসে না।

"প্রাচীন ভারতে বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, মনুসংহিতা ইত্যাদির সর্বত্র অহিংসাকে মানবধর্ম হিসাবে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া সত্ত্বেও যে মানবধর্মাশ্রয়ী দেশ জাতি সমাজকে রক্ষা ও পালনের উদ্দেশ্যে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করা রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির একটা প্রধান কর্তব্য বলিয়া বোধ হইত সে কথাও আজ বিস্মৃতির মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে।

"মানবধর্মের আদর্শে প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন প্রায় সহস্র বৎসর পৃথিবীর বক্ষে স্বমহিমায় তাহার জাতীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিরাজ করিয়াছিল তাহাও কেউ ভাবিয়া দেখে না। এমন কি পরবর্তী কালে নানা বৈদেশিক আক্রমণে ক্রমাগত পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও বারে বারে ভারতীয় জাতীয়তা ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং বহির্ভারতেও আত্মবিস্তার করিয়াছে ইহা কারও দৃষ্টি-পথে উদিত হয় না।

"আজও তাহার সেই ধারা চলিতেছে। এই চিরন্তন মানবধর্মের জাতীয় ধারাই জীবনের বৈশিষ্ট্য। ইহা মূলত কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমতবাদ প্রচারের ধারা সমাজ ও রাষ্ট্রে নবযুগের প্রবর্তন করিবে।

"আজ পর্যন্ত ভারতে যতগুলি ধর্মমত আসিয়াছে এবং ভারতেও যতগুলি ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, সকলের বিশেষ ধারা, যথা—

কাহারও মানব সেবাবাদ, কাহারও সমাজবাদ, কাহারও জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, কাহারও অনাসক্ত মতবাদ এই মহাজাতি গঠনের কাজে সহায়তা করিবে।

"এই সূত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা অর্থাৎ মানব-ধর্মের নীতি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে। সেই আদর্শ ত্যাগ ও সত্যের আদর্শ, জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্য যাহার ভিত্তি।

"পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিয়া প্রকৃত সুখ ও শক্তি স্বাধীনতার অধিকারী করাই ইহার নীতি। এই নীতি ও আদর্শকে বাদ দিয়া ভারতে মহাজাতির কল্পনা অলীক মাত্র।

"সে যাহা হউক, জনকল্যাণ বস্তুটি কি? জনগণের প্রাণের চাহিদা কি? অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য—এগুলি প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের অর্থ এই নয় যে এগুলি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জীবনের মূল লক্ষ্যের গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবে। প্রকৃত পক্ষে হাজার অভাব-অনটনে অস্বাস্থ্য অশিক্ষা বিপদ-আপদ সত্ত্বেও জীবনের কোন্ জিনিষটা বন্ধ হইয়া থাকে? ইহার মধ্যে ধনার্জন, বংশবৃদ্ধি, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, নৃত্যগীত, কাব্যসাহিত্য ও রাজনীতির আন্দোলন সবই তো চলে? তবে কি জীবনের মূল জিনিসটাই বন্ধ থাকিবে? তাহা অসম্ভব। প্রকৃতির নিয়মেই তাহা কাজ করিবে। যদি ঠিক পথে প্রকাশ না পায়, তবে বিপথে প্রকাশ পাইবে। এই মূল জিনিসটি মানবিকতার ভিত্তি, ব্রহ্মচর্য জাতীয় জীবনে প্রকাশের পথ না পাইলে ইহার ব্যর্থ শক্তি বিপথে বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে।

"সুতরাং দুঃখ দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য অশিক্ষা ইত্যাদির অজুহাতে ইহাকে অবহেলা করা জাতীয় জীবনের পক্ষে মারাত্মক ভুল। বিশেষতঃ সর্বদেশে যে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজ নিম্নস্তরে জনগণকে পরিচালিত করেন, যাঁহারা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে রূপদান

করেন, তাঁহারা তো অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্যের অভাবে একান্ত পীড়িত নন। তবে কি কারণে ইঁহাদের স্তরের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনে ভারতের জীবনাদর্শের সাধনা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়?

"আসলে এ ক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনীতির মোহ এত যে গভীরতর চিন্তার কোন আগ্রহ নাই। চিন্তা করিলে ইহারা বুঝিতে পারিতেন যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পিছনে দেশব্যাপী মনুষ্যত্বের সাধনা ও শক্তির উন্মোচন।"

১৯২৭ সাল। এই সময়ে 'সত্যেন বোস' এই নামটি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ধ্বনিত হয়েছে।

বিজ্ঞান জগতে এসেছে আলোড়ন।

শুধু কি বিজ্ঞান?

সাহিত্য ও সংস্কৃতির আসরেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন এবং নিতে পেরেছেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে যে বিবরণ দেখা যায় তা হচ্ছে এই—

"অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানরূপে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের অধ্যাপনার খ্যাতি ও তরুণ বিজ্ঞানীদের পরিচালনা করিবার পদ্ধতি সারা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্বত্রই আজ আলোচিত হইতেছে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা। 'সত্যেন বসু' এই নামটির মধ্যে যেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা বিরাজ করে। উৎস সন্ধান করিলে দেখা যায় যে এর মূলে ইউরোপের এক মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন কর্তৃক তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি। আজ তাই আপেক্ষিক তত্ত্ব আলোচিত হইলেও সেইখানেই উদ্বোধকের নামের সহিত সত্যেন বোসের নাম উচ্চারিত

হয়। আমাদের ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে তাঁর দানের জন্য ভারতবাসী মাত্রই গৌরব বোধ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ?"

দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এই দুই কাজের দায়িত্ব সত্যেন্দ্রনাথ যেভাবে পালন করেছিলেন তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালে তিনি চলে এলেন তাঁর জন্মস্থান কলকাতায়।

ঢাকায় যাবার সময় ১৯২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনে মূল সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে 'কোয়াণ্টামবাদের' প্রতি হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা প্রকাশ ও তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য আলোচনা করেন।

তাতে দেখা যায়, জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতামত হাইসেনবার্গের চেয়ে আইনস্টাইনের নিকটতর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ আঠারো বছর অবস্থানকালে সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষকতা ও গবেষণার জগতে এসেও নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই আগ্রহী হয়ে একটি বৈঠকী সভা স্থাপন করলেন।

নাম দিলেন—'বারো-জনা'।

সভার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ও অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে পালাক্রমে সভ্যদের বাড়ীতে এই বৈঠক বসত।

এই সভার উল্লেখযোগ্য সদস্যরা ছিলেন—রমেশচন্দ্র মজুমদার, আর্থার হিউজ, অন্নদাশঙ্কর রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, সর্বাণী গুহ সরকার, মামুদ হোসেন প্রমুখ।

সত্যেন্দ্রনাথের এই 'বারোজনা' সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরবর্তী কালে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—'ত্রিশ বছর আগে আমি ঢাকায় বদলি হই। আলাপ করতে আসেন এক ভদ্রলোক। বারো-জনের একটি মণ্ডলী গঠন করা হবে। আমি তাঁদের একজন হতে রাজী কিনা? তালিকাতে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের নাম। আমি তার এক জায়গায় নিজের নাম দেখে ভাগ্যবান মনে করি। রাজী না হয়ে পারি? ভদ্রলোক বলেন, বারোজনের বাড়ী বারো মাসে বারোটা বৈঠক হবে।...'বারো-জনা' ছিল আমাদের মিলন ভূমি। নইলে অত বড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে উদীয়মান সাহিত্যিকের মিলবে কোন সূত্রে?'

'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ' এই প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালে সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য লিখলেন—

"বিজ্ঞানের সাধনা ব্যক্তির নয়, জাতির নয়, সমগ্র মানব সমাজের। এই আদর্শকে সামনে রেখেছিলেন জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। সত্যেন্দ্রনাথ এই দুইজন আচার্যের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেই তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে তাঁর শিক্ষক জীবনের আর একটি অধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের 'খয়রা' অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যানুশীলনে এক প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হচ্ছে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের সহায়তাদানে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না।"

'শিক্ষক হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য' এই প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন—

'শিক্ষক হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি গতানুগতিক ভাবে পাঠক্রম বা সিলেবাস অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের কোনদিন শিক্ষা দিতেন না।

সত্যসন্ধানী সত্যেন্দ্রনাথ চাইতেন—তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের জ্ঞানের পরিধি শুধুমাত্র পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর মধ্যেই যেন বেঁধে না রাখে। তিনি যথার্থ আচার্যের মতো তাদের মনে জ্ঞানরাজ্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিতেন।

যাতে তারা কেতাবী রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তহীন জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।

কলকাতার স্নাতকের শ্রেণীতে তিনি বাংলা ভাষাতেই পদার্থ বিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয় ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতেন। খুবই জটিল বিষয়গুলিকে তিনি বাংলাতে এমন সরল ও সহজভাবে ব্যক্ত করতেন যে তা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হতো না।

যে জটিল তত্ত্বকথা আমাদের কাছে খুব নীরস বলে মনে হতো, তা আচার্য বসুর মাতৃভাষায় আলোচনায় প্রসাদ গুণে প্রাঞ্জল ও সরল হয়ে উঠত।"

॥ সাত ॥

কবি বিষ্ণু দে সত্যেন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন—

* * *

কৌতূহল অন্তহীন দুর্গম, শূন্যের তত্ত্বে
তথা নিরপেক্ষ দৈনন্দিনে
জিজ্ঞাসা ভ্রমর সদা জ্ঞানে জ্ঞানে।
জানিনা এ অতিমস্তিকের জটিলতা
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা, বেহিসাবী,
নির্বিকার, সাত্ত্বিক প্রসাদ।
অথচ হৃদয়বত্তা, এখানে দুর্লভ কি নির্বোধ কিবা মূর্খে,
এখনো যে দিন যায় সত্তা বেচে কিনে সকালে বিকালে,
প্রতিদিন একই রসাতলে,
তাই আমাদের আত্মজ, উদ্‌ভ্রান্ত, অবসাদ, কূট ঘৃণা, লুব্ধ, দুঃশীলতা,
আমাদেরই কলকাতায় এ জাতক আশৈশব প্রতিভায় অগ্নিময়,
সত্তরের জন্মদিনে তাই জরা শুধু শোত্রেই ভ্রান্ত।
অপত্য শিশুর শতায়ু খুব স্বাভাবিক।

[বিষ্ণু দে]

সারকুলার রোডের বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিপরীতে ফেডারেশন হলের একতলায় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস দীর্ঘকাল ছিল।

১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পরিষদের প্রথম অধিবেশন।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কি সম্ভব?

এর উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ সেদিন সগর্বে বলেছিলেন—'যাঁরা বলেন

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় তো বিজ্ঞান জানেন না।'

পরিষদের মুখপাত্র— 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি ছিল একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

তবুও পরিষদের জন্য নিজস্ব একটা বাড়ি দরকার। হলও। তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গোয়াবাগানে তাঁর বাড়ির কাছে একখণ্ড জমি কিনে যেদিন পরিষদ ভবনের ভিত্তি স্থাপন হয় তা বলার নয়, বিশেষ করে বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথের চোখেমুখে আনন্দের বন্যা।

১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারী বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথের স্মরণীয় বৎসর প্রসঙ্গে সেদিনকার সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকায় যা প্রকাশিত হল তা হচ্ছে ঠিক এই রকমের—

"সত্যেন্দ্রনাথ বসু সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী নিবেদন করল তাঁকে প্রাণের অর্ঘ। তাঁর সত্তরতম জন্মতিথি পালন করবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস দেখা দিল সর্বস্তরের বাঙ্গালীর মধ্যে। এই উৎসব শুধু বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানীর জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো মহাজাতি সদনে। শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ বিমণ্ডিত ঋষিকল্প এই বিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে দলে দলে এসেছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রগোষ্ঠী, সতীর্থ ও বন্ধুগণ। এসেছিল সাধারণ মানুষও যাঁদের কাছে সত্যেন বোস একটি কিংবদন্তী মূর্তি হয়ে উঠেছিলেন। এই সেই বিজ্ঞানী যাঁর নাম মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের উত্তর সাধক এই মানুষটিকে সেদিন শুধু যে ভারতের রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তা নয়, বিদেশ থেকেও একাধিক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও রয়াল সোসাইটি প্রমুখ বিদেশী সংস্থাও অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁকে। মহাজাতি সদনের সেদিনকার সেই স্মরণীয় উৎসব সভায় সুসজ্জিত মঞ্চের উপর থেকে অভিনন্দনের উত্তরে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

আবেগ-স্পন্দিত কণ্ঠে বললেন—"স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা দায়িত্ব এসেছে। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিতের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন মাতৃভাষার মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে যায়।"

সেদিন সত্যেন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্রটি প্রদান করা হয়েছিল, সেটির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল—

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

সপ্ততিতম জন্মদিনে

আচার্য দেব,

সুদীর্ঘ কাল পদার্থ বিদ্যার দুরূহ গবেষণায় সাফল্য লাভ করে জগতের বিজ্ঞান সাধনাকে তুমি বিশেষভাবে সম্পদশালী করেছ।

যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় ভারত আজ বিশ্বের বিজ্ঞান সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত তুমি তাঁদেরই অন্যতম। বিজ্ঞানভারতীর অতিথিশালায় তোমারই হস্তের প্রদীপ অনির্বাণ শিখায় আজ প্রদীপ্ত।

আমরা তোমার স্বদেশবাসী, ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ—আমাদের গৌরবের অবধি নেই।

*　　　　*　　　　*

হে বিশ্ববরেণ্য,

বাংলার সুযোগ্য সন্তান তুমি। কিন্তু তোমার কথা শুধুমাত্র বাংলা বা ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে আজ পরিব্যাপ্ত।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চায় তুমি উদ্বুদ্ধ করেছ দেশবাসীকে।

বিদ্যার আরাধনায় তুমি উৎসর্গ করেছ তোমার সমগ্র সত্তাকে। সে পূজার শুভ্র জ্যোতি দিক-দিগন্তরে বিচ্ছুরিত। শিশুসুলভ সারল্য আর মধুময় হাসির সঙ্গে কঠোর সত্যনিষ্ঠা তোমার মানবতাকে মহিমান্বিত করেছে। তোমার গভীর মানবপ্রীতি ও চরিত্রমাধুর্যে সকলেই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তুমি আমাদের হয়েও

সকলের, ভারতের হয়েও বিশ্বের। তোমার সর্বময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তুমি আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার গুণমুগ্ধ দেশবাসী

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ নিজেকে প্রকাশ করেছেন নানাভাবে—নানা দিক দিয়ে।

সেটা হল তাঁর সাহিত্যপ্রীতি আর সেই সঙ্গে সাহিত্যসেবা।··· ছাত্রজীবন থেকেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ দেখা দেয়।

আর এই অনুরাগ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল।

তাঁর শেষ জন্মদিনে একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন।

দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়।

তাঁর বৈঠকখানায় প্রতি শনিবারের আসরে বিজ্ঞান সাধককে দেখা গেছে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে।

তিনি ছিলেন কাব্যরসিক, সাহিত্যরসিক আর সঙ্গীতপ্রিয়।

সত্যেন্দ্রনাথ একজন দক্ষ এসরাজ বাজিয়ে ছিলেন। আজীবন বাজিয়েছেন। অবসর বিনোদনে এই এসরাজ ছিল তাঁর কাছে পরম প্রিয়।

তিনি বাংলা সাহিত্য ছাড়াও ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী সাহিত্য পর্যন্ত পড়তেন সমানভাবে।

সবুজপত্র, বিচিত্রা, পরিচয় প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ।

১৯৫৮ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জব্বলপুর অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মূল সভাপতি।

তিনি বলেছিলেন—সাহিত্যকে শুধু কতক লোকের মন গড়া

কাহিনী দিয়ে বিকৃত করা চলবে না। এই মাটির পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষার কথাও সাহিত্যিকদের বলতে হবে এবং তা ব্যক্ত করতে হবে সহজ সরল অন্তরস্পর্শী ভাষায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সহযাত্রী' ও আত্মশক্তির জয় তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থ 'জাপানে' উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথকে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে বের হল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিচিত্রা। সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চা অগ্রসর হোক এই কল্যাণে এর আত্মপ্রকাশ।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর স্নেহ থেকে তিনি ব্যর্থ হননি। তিনিও জগদীশচন্দ্রকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বরাবর। তাই তো আমরা দেখি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ওপর এক প্রবন্ধ বের হল তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায়। এখানে সেই অসামান্য প্রবন্ধটি আমরা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি—

"বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রেখে যে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্বের দরবারে ভারতকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জড় উদ্ভিদ জীবের মধ্যে একই চেতনার সন্ধান দিয়ে তিনি বৈদিক ঋষিদের মতোই বিবিধের মধ্যে মহান মিলনের মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। তিনি কেবল একচক্ষু বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখেন নি, দেখেছেন দার্শনিকের সামগ্রিক দৃষ্টিতে, দেখেছেন শিল্পীর সুষমামণ্ডিত দৃষ্টিতে। তাঁর সেই জীবন ও বাণী আমাদের এক পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দেয়।

জগদীশচন্দ্রের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ছিল ঢাকার বিক্রমপুর রাড়িখাল গ্রামে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহ

শহরে জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র তখন কর্মসূত্রে ঐ শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, স্বদেশপ্রীতি, মানুষের প্রতি নিঃসীম মমত্ববোধ, দেশীয় সংহতির প্রতি অনুরাগ পুত্র জগদীশচন্দ্রের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্রের জীবনে স্নেহশীলা জননী জবাসুন্দরীর অবদানও কম নয়।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় সাধন ও দেশের জনগণের সঙ্গে নিজের মনের সংযোগ যদি একমাত্র কাম্য হয় তবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রতিটি শিশুর শিক্ষার উদ্বোধন হওয়া উচিত। পুত্রকে তিনি গ্রামের পাঠশালায় পড়িয়েছিলেন। স্কুলে জগদীশচন্দ্রের সহপাঠীদের প্রায় সবাই ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিশু। ১৮৬৯ সালে জগদীশচন্দ্র কলকাতার সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হন। ১৮৭৫ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ বিভাগে ভরতি হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পাশ করেন। এরপর জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে গিয়ে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন। কিন্তু শারীরিক কারণে ডাক্তারী পড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ১৮৮৩ সালে জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি বিজ্ঞানে ট্রাইপোস হলেন। ঐ একই বছর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্-সি ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরলেন।

স্বদেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। সে সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে একই যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ভারতীয় অধ্যাপকের বেতন ছিল ইউরোপীয় অধ্যাপকদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ, আর চাকুরি পাকা না হলে তারও অর্ধেক। তাছাড়া ছাত্রদের পঠন-পাঠনের ধরনও ছিল বড় অদ্ভুত। সঠিক অর্থে, সেখানে ল্যাবরেটরীর কোন অস্তিত্ব

ছিল না। জগদীশচন্দ্র উঠে পড়ে লাগলেন প্রত্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের পড়ানোর ব্যবস্থা করতে। তাঁর প্রতিবাদ জানালেন অপমানজনক কোন বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তিনি বেতন নেওয়া বন্ধ করলেন। এ সংগ্রামে জয়ী হতে তাঁর সময় লেগেছিল তিন বছর।

ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় বস্তু এবং সে সম্পর্কে হার্থসের গবেষণ তৎকালীন বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন বিষয়টি নিয়ে তিনি গবেষণা করবেন। এ উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে নিতান্ত অনভিজ্ঞ দেশীয় কারিগরদের দিয়ে তিনি যে সব সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি তৈরী করেছিলেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে বোধ করি তা নজিরহীন। তাঁর উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি, বেতার বিজ্ঞানের যুগান্তকারী গবেষণা করে বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ্বে সর্বপ্রথম কোষের মাধ্যমে স্থানান্তরে বার্তা পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায় আধুনিক রিমোট কন্ট্রোলে তিনিই ছিলেন পথিকৃত। কেবল পদার্থ বিজ্ঞানেই নয়, জীবন বিজ্ঞানেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার পথ ধরেই তিনি আকস্মিকভাবে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রাণী ও জড়ের প্রকৃতির মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে দেখালেন, বাহ্যিক উত্তেজনায় প্রাণী যেমন সাড়া দেয়, জড়পদার্থও তেমনি সাড়া দেয়। তাঁর এই গবেষণা সমসাময়িক বিজ্ঞান মহলে আলোড়ন এবং বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিরুদ্ধ আলোচনা ও সমালোচনাকে জয় করে নিতে পেরেছিলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর গবেষণা সমসাময়িক কালের চেয়ে বহু যুগ এগিয়ে ছিল, তাই বোধ করি সহজে তিনি তাঁর অসাধারণ মৌলিকত্বের স্বীকৃতি পাননি। বর্তমান যুগে তাঁর গবেষণা নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে

যে আধুনিক জীবন বিজ্ঞান 'বায়োফিজিক্স' নামক বিজ্ঞানশাখার তিনিই জনক।

সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর কাজের উপযোগী করে সরল যন্ত্র নির্মাণে জগদীশচন্দ্রের ছিল বিরল প্রতিভা। সে সময় জগদীশচন্দ্রের অর্থবল ছিল না—ছিল না উপযুক্ত যন্ত্রাগার ও যন্ত্রী। তবুও গবেষণার প্রয়োজনে তিনি শতাধিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করিয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত বাইটোত্রাক, অপিট্যাকাল যন্ত্র আজও বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়। তিনি এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রমাণ করেছিলেন 'উদ্ভিদ জীবন' প্রাণীজীবনের ছায়ামাত্র।

একজন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের কোনো একটি বিশেষ শাখার পুরোধা হয়েছেন এটা প্রায়শ দেখা যায়। কিন্তু একই ব্যক্তি বিজ্ঞানের দুদিকে পুরোধা হয়েছেন এমন বড়ো একটা দেখা যায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন সেই দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। একটি শিল্পে অনগ্রসর ও পরাধীন দেশে বিজ্ঞান চর্চার সংগ্রাম শুধুমাত্র ভাবজগতে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের পরাধীনতা ও আরোপিত আনুগত্য অবস্থা থেকে তৈরী বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামই ছিল জগদীশচন্দ্রের সমস্ত জীবন। জগদীশচন্দ্রের কর্মজীবনের প্রধান হাতিয়ার ছিল স্বনির্ভরতা।

তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে—তাঁর প্রথম রয়াল সোসাইটির বক্তৃতার পর।

১৯১৫ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নেন। এর পর তিনি তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি দেশবাসীর কাছে এক আবেদনে বলেছিলেন, 'আমার সোপার্জিত অর্থে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়েছে মাত্র। এই মন্দিরের বৈজ্ঞানিক কর্মধারাকে আমি সুদূর প্রসারিত করতে চাই।'

জগদীশচন্দ্রের এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন দেশের সর্ব শ্রেণীর মানুষ।

১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দির আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রধানত বিজ্ঞানী হলেও তাঁর মধ্যে একটা দুর্লভ শিল্প-চেতনা ছিল। সাহিত্য কর্মে তিনি বেশী সময় দিতে পারেন নি, কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তাতেই তিনি তাঁর সাহিত্য-বোধের ছাপ রাখতে পেরেছেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন 'অব্যক্ত' প্রকাশ করে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন……'আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'তোমার অব্যক্তর অনেক লেখাই আমার পূর্ব পরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া বারবার ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞান রাণীকেই তুমি সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবি করিতে পারিত, কেবল তোমার অনবধানেই অনাদৃত হইয়া আছে।'

১৯৩৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে আচার্য জগদীশচন্দ্র গিরিডি শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তাই জগদীশচন্দ্র তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিজ্ঞান সাধনায় তাঁর নিষ্ঠা এবং তাঁর দেশপ্রেম আজকের তরুণ বিজ্ঞানীদের নিঃসন্দেহে প্রেরণা দেবে।

প্রসঙ্গত আমাদের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কথাও মনে আসে। সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ দু'জনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে স্মরণ করাও আমাদের

একান্ত কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পত্রিকায় যা বের হয়েছিল, তার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হল—

"উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নানাজাতির যে মহাপ্লাবন জেগেছিল, তার মধ্যস্থলে ছিল বাঙালীর সাধনা, ত্যাগের সাধনা। বৈরাগ্যের সাধনা। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও সাধনা। এলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, তামসিক ধর্মান্ধতা ও গ্লানি গেল কেটে। এলেন বঙ্কিমচন্দ্র, জাতির কর্ণে দিলেন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র, এলেন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ—মুহূর্তে শতাব্দীর জড়তা ঘুচে গিয়ে আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হোল। এলেন বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, উচ্চকিত হয়ে উঠল আশা ও আত্মচেতনা। একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছাড়াও মতিলাল নেহরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সমসাময়িক। জন্মেছিলেন দেশগৌরব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের কয়েকমাস পরে অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার করতোয়া নদীর তীরে জাড়ুলি কাটিয়ারা গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করে প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় চলে আসেন এবং হেয়ার স্কুলে ভরতি হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে (১৮৭৯) তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে ভরতি হন। বিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেই কলেজের অধ্যাপক। সুরেন্দ্রনাথের মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শোনার লোভেই প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই কলেজে যোগদান করেন। এখানে পড়ার সময় বিজ্ঞান চর্চার সুবিধার জন্য তিনি বাইরের ছাত্র হিসাবে (External) প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান শ্রেণীতে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের ক্লাস করেন। কলেজে পড়া শেষ করে ১৮৮২ সালে 'গিল্ডক্রাইস্ট' বৃত্তিলাভ করে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৮৭তে তিনি রসায়ন শাস্ত্র গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্-সি. উপাধি এবং ঐ

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হোপ পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৮৮ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে পরের বছর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

এই শর্ত মেনেই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে, পরে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গণিত অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি যেমন আপন অধ্যাপনার গুণে ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারতীয় বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। এটি 'নেচার' ক্লাব নামে প্রসিদ্ধ। এর ফলে ভারতে রসায়ন চর্চা এবং গবেষণার পথ সহজ হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এদেশের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফর্মিসিউটাক্যাল লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজে বিবিধ পিল্লোন্নতি বিধানের এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অদম্য উৎসাহ ছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁরই প্রেরণায় ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি হয়। ১৯২৪-৪৪ তিনি যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদেও ছিলেন—১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। বিশেষভাবে প্রফুল্লচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে এক অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে তাঁর অগণিত ছাত্র, সহকর্মী ও দেশবাসীর সামনে একটি অম্লান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। দেশ-বিদেশ থেকে তিনি আরো অনেক সম্মান লাভ করেছিলেন।

কর্মসূত্রে বৈজ্ঞানিক হলেও ব্যক্তিগত জীবনে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন নিরহংকারী—অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। পরিচিত

বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে বিলাসিতা ও অপব্যয় প্রবণতাকে ঘৃণা করতেন। ছাত্র শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক ছিল। দেশের আন্দোলনের বীরদের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা, এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা প্রবর্তনের কথা সুবিদিত। তাঁর 'আত্মচরিত' (Life of Experiences of Bengali Chemist) ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধাবলী। এক কথায় সর্ববিধ জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগ ও সহায়তায়, সর্বোপরি বৃহত্তর অর্থে মানব কল্যাণে তাঁর উপার্জিত অর্থের অকৃপণ বিতরণ, তাঁকে আজও বিশিষ্ট স্বর্গীয় চরিত্র করে রেখেছে। তাঁর বিশেষ ছাত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রিয়দারঞ্জন রায়, নীলরতন ধর, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অসাধারণ মনীষা ও অতুলনীয় হৃদয়বেত্তার গুণে আচার্য রায় আজও জগদবরেণ্য হয়ে আছেন।"

বিজ্ঞানের সাধক হয়েও 'সাহিত্য ও মানব জীবন' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বরাবরই ছিল, এ প্রসঙ্গে একটি আলোচনায় আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে এই রকমের—

"সৃষ্টির আদিম প্রভাতে মানুষ নিজেকে জেনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। অন্যের কাছে নিজেকে জানতে চেয়েছে সে। আমার ব্যক্তিগত সুখ-সহানুতুতি অন্যের কাছে প্রকাশ করে আমি তৃপ্ত হতে চেয়েছি। এই জানানোর মধ্যে দিয়ে আমার আনন্দ। এই জানানোই সাহিত্য সৃষ্টির আদিমতম রূপ। ভাষার জন্মই হয়েছে নিজেকে অন্যের কাছে জানানোর জন্যেই। আমাদের সঙ্গীত, আমাদের নৃত্যকলা ইত্যাদি সবই নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করার আনন্দের মধ্যে প্রকাশিত।

এই প্রকাশ করার প্রেরণার মধ্যে দিয়েই সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধ হয়।

"সাহিত্য পাঠের মধ্যে আমরা প্রধানত দুটি কাজ করে থাকি। এক, সমসাময়িক কালের কাছের বা দূরের মানুষকে যেমন জানি, তেমনি অনাগত কালের জন্য আমাদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান ধারণা লিপিবদ্ধ করে থাকি। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের সামাজিক জীবন, তাঁর রীতিনীতি, তার সংস্কারের ভাবনা সমস্ত দিকেই প্রকাশ করি। যে কোন দেশের সাহিত্যকে জানতে হলে সেই দেশের জীবনযাত্রাকে জানতে হয়। তাদের সংস্কার, তাদের আচার-আচরণ—নানা অনুষ্ঠান অর্থাৎ জীবনযাত্রার বিচিত্র দিক সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই সাহিত্য পাঠ শুধু ব্যক্তিগত পরিতৃপ্ত সাধনই করে না, সাহিত্য পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা সমকালীন মানুষকে, অতীতের জীবন-ধারণাকে যেমন জানি, তেমনি বিদেশী সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে অন্য দেশের জীবনচর্চা আমাদের চিত্ত দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। এইভাবে আমরা আনন্দ ও শিক্ষা একই সঙ্গে আহরণ করতে পারি।

"তাই আমরা দেখতে পাই, সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমাদের চিত্ত যদি আবেগ আকুল হয়, মিলনানন্দে উদ্বেল হয়, দুঃখে, শোকে খিন্ন হয়, সঙ্গীহারা চিত্ত যখন সঙ্গ কামনা করে, তখন সাহিত্যই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। যে সঙ্গী কখনো ছলনা করে না, বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সেদিক দিয়েও সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সঙ্গী ছাড়া মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে না।

"সাহিত্য জীবনের দর্পণ। মানব চরিত্র বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয়। সাহিত্যিক তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই মানব চরিত্রের অপার রহস্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এইভাবে আমরা জগৎ ও

জীবনকে চিনতে পারি। সুতরাং সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাই। অন্যদিকে এই সাহিত্য নানা অনুভূতির প্রকাশে মানব জীবনের বিচিত্র ভাবনাকে প্রকাশ করে আমাদেরই চিনিয়ে দেয়। বিজ্ঞান আমাদের শুধু তথ্য দিতে পারে, কিন্তু তথ্যকে রসায়িত করে সাহিত্য। আর এই রস থেকেই তো সাহিত্য। আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে সাহিত্য পাঠ তাই অপরিহার্য। সাহিত্য নিছক কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক নয়, ইতিহাস বা দর্শন, বিজ্ঞানের উপাদানও সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং সাহিত্যকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

"মানুষের জানার যেমন শেষ নেই, সাহিত্যের বিশ্লেষণেরও তেমন শেষ নেই। সাহিত্যে শেষ কথা কেউ বলতে পারে না। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ তার শিক্ষা, রুচি ও প্রবণতা দিয়ে সেই সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে একেবারে রস ও জ্ঞান লাভ করে সমৃদ্ধ হতে চেয়েছে। তাই সাহিত্য পাঠের স্বার্থকতা নির্ভর করে কিভাবে কোন উদ্দেশ্যে আমি তা আমার জীবনে গ্রহণ করে রূপায়িত করব। শুধু তাই নয়, কিভাবে আমার মানস লোকে তাকে কাজে লাগায়, সেইখানেই তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।"

॥ আট ॥

শিক্ষক জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এক অধ্যাপক বলেছেন—

"শিক্ষক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই তিনি সেদিন ছাত্র মহলে অমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আচার্য পি. সি. রায়ের পর বোধ করি সত্যেন বোসই প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা কোমল অনুভুতিশীল হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিভূত হতো। তাঁর কাছে তাঁরা যে শুধু ছাত্র-ছাত্রী তা নয়, প্রত্যেকেই যেন তাঁর অত্যন্ত আপন জনের একজন। তিনি নিজে থেকেই প্রত্যেকের পারিবারিক জীবনের খোঁজখবর নিতেন। নিজে অসামান্য হলেও সত্যেন্দ্রনাথ এসেছিলেন একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, তাই ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যজীবনের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল। তাদের সবরকম সহায়তা করতে তিনি এগিয়ে আসতেন। এই সংবেদনশীল হৃদয়ই একদা বিপুল ছাত্র ও গবেষক-গোষ্ঠীকে তাঁর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এযুগের ছাত্রদের কাছে তিনি যেন দ্বিতীয় পি. সি. রায় হয়ে উঠেছিলেন।"

যাঁরা গবেষণায় রত ছিলেন সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন জ্ঞানরাজ্যের রত্নাকর।

বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্য মেলে ধরেন তাঁর ছাত্রদের কাছে।

বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী।

এ প্রসঙ্গে পশুপতি ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"সত্যেন বোস ছিলেন এই শ্রেণীর বিজ্ঞানী। তিনি যখন বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করতেন তখন তিনি অসীম আগ্রহ নিয়ে যেমন গণিত গবেষককে সহায়তা করেছেন, তেমনি আবার রসায়ন অথবা

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর সঙ্গে সমান আগ্রহের সঙ্গে লিপ্ত থাকতেন। সত্যেন বোসের মত বিজ্ঞানের এত বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক ও গভীর পরিচিতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না।"

সত্যেন্দ্রনাথ যদিও প্রধানত ছিলেন একজন তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানী (Theoretical Scientist) তথাপি পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তিনি হাতে কলমে যন্ত্রপাতি তৈরী করতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পদার্থ বিজ্ঞানের একটা ল্যাবরেটরি পরিচালনা তিনিই করতেন।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তিনি অবসর নেন।

এই বছরেই তিনি তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ মেঘনাদ সাহাকে হারালেন। মেঘনাদ সাহার মৃত্যুতে তিনি স্তব্ধ হয়েছিলেন। শুধু বলেছিলেন : মেঘনাদ ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

'বিজ্ঞান সাধকের জীবনের নানা স্মরণীয়' ঘটনার কথা উল্লেখ করে শ্রীসতীশচন্দ্র খাস্তগীর আমাদের যা জানিয়েছেন তা হচ্ছে ঠিক এই ধরনের—

"১৯৫৬ সালটি বিজ্ঞান সাধকের জীবনে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরেই তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। তাঁর চল্লিশ বছর কাল সগৌরবে তিনি শিক্ষকতা করার পর বাষট্টি বছর বয়সে যখন তাঁর বিশ্রাম নেবার সময় তখন তিনি গ্রহণ করলেন এই দায়িত্বজনক পদ। এর থেকেই বোঝা যায় কি রকম প্রচণ্ড কর্মশক্তির আধার ছিলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ যে ক' বছর 'বিশ্বভারতী'র উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ সময়ে তিনি নানা বিভাগে অনেক সংস্কার সাধন করেন। যার ফলে এই

শিক্ষায়তনটির অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষক হিসাবে যেমন তাঁর যোগ্যতা ছিল, তেমনি বৃহৎ শিক্ষায়তনের পরিচালনাতেও তিনি সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।”

১৯৫৬ সাল।

এই সময় ইংলণ্ডের ব্রিটিশ বিজ্ঞান অনুশীলনী সমিতি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। উদ্দেশ্য তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে।

১৯৫৭ সাল।

এই সময় তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

এই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথকে সম্মানিত ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার সত্যেন্দ্রনাথকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় জয়ের মালা তিনি পেলেন যখন ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলো (Fellow) মনোনীত করে।

এরপর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে ডক্টরেট ও দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। বাংলার গৌরব আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ—তাঁর জয়গৌরবে আমরাও গৌরব বোধ করি।

জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পর সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে মূল ভবনের একতলার ঘরটিতে নিজের গবেষণার কাজ নিয়েই থাকতেন।

শুধু নিজের গবেষণা নয়, দেশের নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকল্পে ও বিজ্ঞান প্রগতির নানা কাজে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত।

তাঁর বিদেশ যাত্রা প্রসঙ্গে সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু দৈনিক 'যুগান্তরে' যা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি—

"বিদেশী বৈজ্ঞানিক সংস্থার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে অনেকবার এবং ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ বহুবার বিদেশে গিয়েছেন।

১৯৫৩ সালে আন্তর্জাতিক পরিষদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার জন্য ইউরোপের উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় ভারত থেকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি আমন্ত্রিত হন। সে সময় তিনি প্যারিসে সম্মেলন শেষ হবার পর ইংলণ্ড ও জার্মানি ভ্রমণ করেন এবং সেই দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মিলিত হন। ১৯৫৩ সালে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আমন্ত্রণে তিনি বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি যখন শান্তি কংগ্রেসে যোগদান করতে যান, তখন বুদাপেস্টে যাবার সময়ই ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমন্ত্রিত হয়ে ঐ সব দেশের আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের কাজ পরিদর্শন করে আসেন। ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংসদের আমন্ত্রণ পেয়ে আবার প্যারিসে যান। ১৯৬২ সালে তিনি জাপানে যান।"

বিজ্ঞানের সাধনায় সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের জয়গানে জয়ী হয়েছেন।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। তাই আমরা দেখতে পেয়েছি—রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব সব বিষয়েই তাঁর সমান আগ্রহ।

জগদীশচন্দ্র বসু বলতেন—'বিজ্ঞানের সকল বিভাগের অগ্রগতি সম্বন্ধে যিনি ওয়াকিবহাল তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞানী।"

তাঁর এক ছাত্র বলেছেন—"আমরা দেখেছি সত্যেন বোস সায়ান্স কলেজে যখন গণিতের কোন একটা দুরূহ সমস্যা সমাধানে আত্মস্থ থাকতেন, তখন আমাদের মনে হতো গণিতই বুঝি তাঁর সব থেকে প্রিয় বিষয়। বস্তুত তাঁর মতো বিজ্ঞানের এত বিভিন্ন শাখায় এমন ব্যাপক ও গভীর পরিচিতি, এমন আগ্রহ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না।"

সত্যেন্দ্রনাথও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উদ্ভাবনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে জনৈক ছাত্র লিখেছেন—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সায়ান্স কলেজে যোগদানের পর আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের মতো তরুণ গবেষকদের যন্ত্রপাতি নির্মাণে উৎসাহিত করতেন, আর বলতেন, তোদের যন্ত্রপাতি তোরা নিজেরাই পরিকল্পনা করে নিজেরাই বানিয়ে নিবি। আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তাম, তখনকার ল্যাবোরেটরীতে যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। হাতে কলমে ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি কেমন করে তৈরী করতে হয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের তা শেখাতেন। আর দেখতাম এসব নিয়ে তাঁর নিজেরও খুব দক্ষতা ছিল। স্যার জে. সি. বোসও তাঁর নিজের এক্সপেরিমেণ্টের জন্য অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিজেই নিজে তৈরী করতেন।"

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। এ সময় সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হওয়া খুব দরকার, কারণ এর ফলে তরুণ গবেষকদের বিজ্ঞান গবেষণায় লিপ্ত থাকার অনেক সুবিধা হবে। তবে এই সব গবেষণাগারকে সুসজ্জিত করে তোলার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি দরকার সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানী না করে আমাদের দেশেই তৈরি করার ব্যবস্থা করা উচিত।"

সত্যেন্দ্রনাথ দেশের শ্রীবৃদ্ধির কল্যাণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন বরাবরই।

॥ নয় ॥

বিজ্ঞান জগতে সত্যেন্দ্রনাথ কি দিয়ে গেছেন? এই আলোচনায় আসতে প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী লেখক দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীর কাছ থেকে যা জানা গেছে তা হচ্ছে এই রকমের—

"বিজ্ঞান জগতে সত্যেন্দ্রনাথ কি দিয়ে গেছেন এর উত্তরে বলা যায় যে বোস সংখ্যায়ন বা Bose Statistics-এর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সাধনা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। বলা যেতে পারে আজকের দিনে পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বত্রই তাঁর পরিকল্পিত ও উদ্ভাবিত 'বোস সংখ্যায়নের' প্রভাব তাতে সুস্পষ্ট ধরা যায়। বলতে পারা যায়, বোস সংখ্যায়ন বিজ্ঞান জগতের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এ তথ্য সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে সমাদৃত। সবচেয়ে বড়ো কথা বোস সংখ্যায়ন তত্ত্বের জন্য এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে সত্যেন বোস এ নামটি চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রইল এ কথা বললে অন্যায় হবে না।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংখ্যায়ণ জগতের অন্যতম দিকপাল ডক্টর ডিরাক এক বার্তায় জানালেন—'অধ্যাপক বসুর এই আবিষ্কার আধুনিক পরমাণু তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতবর্ষ এই অসাধারণ বিজ্ঞানীর জন্য গর্বিত।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমান যুগের যে সব মূলগত (Fundamental) তত্ত্ব বিজ্ঞানে প্রতিথ হয়েছে সেগুলির মধ্যে মৌলিকতায়, গুরুত্বে ও গভীরতায় তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যায় (Theoretical Physics) বোস সংখ্যায়ন নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

১৯৬৪ সালে বিস্মিত হয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'আমার

মতে প্লাঙ্কের সূত্রের (Law) ওপর বোসের কাজ তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যায় একটি অভিনব সংযোজন।

বিজ্ঞান জগতে একটা নতুন তত্ত্বের জন্ম হল। ঘটলো একটা নতুন প্রতিভার আবির্ভাব। সেই তত্ত্ব বোস সংখ্যায়ন। প্রতিভায় বিকশিত সত্যেন বোস।

'সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও পদার্থ বিজ্ঞান ক্ষেত্র' এই বিষয় নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ রায়চৌধুরী ১৯৪৮ সালে মাসিক বঙ্গশ্রী পত্রিকায় এক নিবন্ধ লিখলেন, তা হচ্ছে এই রকমের—

'পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে একাধিকবার। এদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় দুই সতীর্থ বিজ্ঞানীর—সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইলেকট্রনের গতিবিধি এবং আলো ও ইলেকট্রনের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে এমন কিছু তত্ত্ব পদার্থ বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, বলবিদ্যার সাধারণ বিষয়গুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা চারদিকেই আমাদের সাধারণ বস্তুগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করে। কিন্তু পরমাণু ও ইলেকট্রনের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ার বলবিদ্যার সাধারণ নিয়মাবলী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তাদের গতিপ্রকৃতি বুঝতে দরকার নতুন নিয়মাবলী।

সারা বিশ্বের পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিত বিদ্যা যখন এই নিয়ে চিন্তা করছেন তখন সমাধান সূত্রের ইঙ্গিত জানালেন তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি নিজের আবিষ্কৃত পরিসংখ্যান তত্ত্বটি পাঠিয়ে দিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে।

আইনস্টাইন সেদিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জানালেন যে, বসু পরিসংখ্যান অনুসারে চিন্তা করলে আলোক বিকীরণের নিয়ম-

কানুনের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না। এ ছাড়া পরমাণুর মধ্যেকার মৌল কণাদের ধর্ম ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বেশ কিছু নতুন তথ্য জানান বিশ্ববাসীকে।"

বিজ্ঞানে বাঙালী প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন ডক্টর অরবিন্দ রায় চৌধুরী। তার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

"বাঙালী হিসাবে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম স্মরণীয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার তিনটি মূল পর্যায়—বিদ্যুতের চুম্বকের তরঙ্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ, উত্তেজনার ফলে জৈব ও অজৈব পদার্থের তুল্যতা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশীর মধ্যে তুলনামূলক পরীক্ষাবৃত্ত গবেষণা। পরীক্ষাকালে প্রমাণ দিয়েই তিনি প্রথম বিশ্ববাসীকে জানান যে ধাতু, উদ্ভিদ, ও প্রাণীর রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যে কারণেই হোক না কেন বাহ্যিক উত্তেজনায় সকলে এইভাবে ধরা দেয়। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর এক উল্লেখযোগ্য দিক—'মাইক্রোয়েভ বেতার তরঙ্গের আবিষ্কার। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা। কালক্রমে এই বিজ্ঞান গবেষণাগার দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের এক মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

"জগদীশচন্দ্রের সমসাময়িক আরেক বাঙালী বিজ্ঞান প্রতিভা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর আবিষ্কৃত পারদজাত রাসায়নিক যৌগ মারকিউরাস নাইট্রেট বিশ্বের রসায়ন বিজ্ঞানী মহলে বাঙালীর অবদান চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর আরেক উল্লেখযোগ্য অবদান হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সব থেকে বড় দান ও কৃতিত্ব তাঁর শিক্ষাধারায় নব রাসায়নিক গোষ্ঠী সৃষ্টি। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জ্ঞান রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুলিন বিহারী সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ খ্যাতি ও যশ অর্জন করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিজ্ঞানকে বরাবর কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছেন। তার ফলশ্রুতি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'দি বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্।

"মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান চিন্তা মূলত জ্যোতিঃ পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত। জেনার পেক্টার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দেশ-বিদেশের জ্যোতিবিজ্ঞানী মহলে সমাদর লাভ করেছিল।

"অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার আর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি কলকাতার বিজ্ঞান গবেষক কেন্দ্র নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ স্থাপন যা বর্তমানে সারা দেশে নিউক্লিয় পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম পীঠস্থান। ভৌতবিজ্ঞানে বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"সমসাময়িক যুগের অন্যান্য বাঙালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অবদান রেখেছেন দেবেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র, নীলরতন ধর, পঞ্চানন নিয়োগী প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা।

আধুনিক যুগে বাঙালীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারে অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অরুণ শর্মা, অর্চনা শর্মা প্রমুখ।

'চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী বিজ্ঞানীদের মাধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বর ঔষধের আবিষ্কারক, ডঃ সুবোধ মিত্র অপারেশন ইত্যাদি বিশ্বমানের প্রশংসার দাবিদার। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ও পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীর মতে—"সত্যেন্দ্রনাথকে মৌলিক চিন্তা ও আধুনিক পদার্থ বিদ্যার সকল স্তরেই প্রসারিত হতে দেখা যায়। আজকের এই পদার্থ বিদ্যার ইমারত দাঁড়িয়ে আছে

বোস সংখ্যায়ানের স্তম্ভের ওপর। তাঁর এই অবদানের গুরুত্ব এমনই অপরিসীম যে তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা বড় কঠিন।

'বোস সংখ্যায়ন' ভিন্ন তাঁর অন্যান্য অনেক গবেষণাই আজ বিজ্ঞানী মহলে সমাদৃত।

১৯৪০ সালে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর গবেষণা—যা সাহা বোস ইব্যুয়েশন অব স্টেট নামে পরিচিত। যা এক সময়ে আলোড়ন এনেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন গণিতিজ্ঞ ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী, তেমনি পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর প্রতিভা অসাধারণ।

বিজ্ঞান সাধক তিনি।

নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন।

জাপানে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সকল জাতিকে এক নবযুগের সন্ধান দিতে পারেন। সে যুগে বিভিন্ন জাতি বৈষয়িক প্রগতির তারতম্য সত্ত্বেও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঐক্যের সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদি ভাই ভাই সম্পর্ক জেগে ওঠে, তা হলে আমরা সুফলের আশা করতে পারি। আর তখনই সমস্ত প্রচেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন শুধু মাত্র মাতৃভূমির কল্যাণে নয়, সমস্ত মানব জাতিয় কল্যাণে নিয়োজিত হবে।"

সত্যেন্দ্রনাথের এই ভাষণে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের দর্শন ফুটে ওঠে। বিজ্ঞান সাধক তাঁর জীবনের জয় রথে এগিয়ে চলেন।

১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী।

সত্যেন্দ্রনাথের ৮০তম জন্মদিন।

নিজের বাড়ীতে।

অগণিত মানুষ।

প্রীতির ডালি আর শ্রদ্ধার অর্ঘ।

সত্যেন্দ্রনাথ সকলকে সম্ভাষণ জানালেন। সকলের স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তিনি গ্রহণ করলেন।

হায়! তখন কে জানতো এই তাঁর শেষ জন্মদিন।

১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—সোমবার। সেদিন সকাল থেকে অগণিত জনসমুদ্র তাঁর বাড়ীতে, বাইরে।

বেতারে ঘোষিত হল: সত্যেন বসু আর নেই। কিন্তু তিনি রেখে গেলেন তাঁর মহত্ত্ব ও অসাধারণ কীর্তি!

সত্যেন্দ্রনাথ বলে গেছেন: সৃষ্টির রহস্য আমরা কেউ ভেদ করতে পারিনি…॥